KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৮/- ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ আষাঢ়, ১৩৬৭ শ্রাবণ, ১৩৬৭ ভাদ্র, ১৩৬৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 July '60 (0.50) SAMAKALIN

★ ARUNA ★

ARUNA MILLS
MARINA

more DURABLE
more STYLISH

SPECIALITIES

Sanforized :
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH

Printed :
Voils
Lawns Etc.

in Exquisite Patterns

ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

★ ARUNA ★

সম্পাদক । আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

অষ্টম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড দ্বারা প্রচারিত

অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সমকালীন

শ্রাবণ ১৩৬৭

॥ সূচীপত্র ॥

নাট্যশাস্ত্রের রচনাপদ্ধতি। অমিয়নাথ সান্যাল ২০৩

বাংলা ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তন। মনোজিৎ বসু ২১৬

গীতিকবিতা ও গান। আশা দাস ২২৩

তাল গোণা ও সুর শোনা। নরেন্দ্রকুমার মিত্র ২২৯

রবীন্দ্র-রচনার সূচী। পুলিনবিহারী সেন, পার্থ বসু ২৩২

রাজশেখর বসু। হরেন ঘোষ ২৩৬

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। গোপাল ভৌমিক ২৩৭

সুধীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা। সুবিনয় ধর ২৪০

সমালোচনা—ভবতোষ দত্ত ২৪২

মলয়শংকর দাশগুপ্ত ২৪৩

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

প্রাচীন ভারতে 'আশ্রম' একটি পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য হত এবং এর শিক্ষক ও আচার্য্যগণের স্থান যেকোন শক্তিশালী নৃপতিরও উর্দ্ধে ছিল। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা শিক্ষাকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন কারণ তারা জানতেন যে শিক্ষা ও সাধনার মাধ্যমেই মানুষের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকশিত হয়। স্ট্যান্‌ভ্যাকের ট্রেনিং প্রোগ্রাম সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত। এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল স্ট্যান্‌ভ্যাকের সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কার্য্যদক্ষতা বাড়ান।

১৯৫৯ শালে স্ট্যান্‌ভ্যাকের প্রতিষ্ঠানটি ৪৮৫০০ ম্যান-আওয়ারস এরও বেশী খরচ করেছে তিরিশটি বিভিন্ন বিষয়ে কর্ম্মচারীদের শিক্ষা প্রদানের জন্যে। ঐ বিষয়গুলি বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট থেকে শুরু করে মার্কেটিং এবং টেকনিকাল সংক্রান্ত বিষয়ে রিফাইনিং এবং এক্সপ্লোরেশন পর্য্যন্ত। আঠারজন কর্ম্মচারীকে গতবছর বিশেষ এবং উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠান হয়েছিল। বাইশজন স্ট্যান্‌ভ্যাক কর্ম্মচারীকে উচ্চশিক্ষার জন্যে কম্পানীর তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছিল।

স্ট্যান্‌ভ্যাকের এই ব্যাপক ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুধু কর্ম্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজনীয়—বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে স্ট্যান্‌ভ্যাক নিজেদের প্রতিষ্ঠানের বাইরেও এই শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ১৯৫৯ শালে স্ট্যান্‌ভ্যাক সরকারী কিংবা সরকার অনুমোদিত চল্লিশজনকে ঐরূপ শিক্ষা দেয়।

স্ট্যান্‌ভ্যাক — দেশের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করছে

স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত, কোম্পানীর সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ

PSSVOC-108/60-BEN

অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা সমকালীন শ্রাবণ তেরশ' সাতষট্টি

নাট্যশাস্ত্রের রচনা পদ্ধতি

অমিয়নাথ সান্যাল

রচনা-পদ্ধতি আলোচনার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হয়েই সর্বাগ্রে পরতন্ত্র সিদ্ধান্তের চশমা খুলে ফেলা উচিত। সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের অঞ্জন চোখে লেগে থাকলেও ক্ষতি করে না; বরং সাহায্যই করে। অবশ্য, যাঁরা "কোটেশন্‌" মার্কা পরতন্ত্র চশমা ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাঁদের পক্ষে হঠাৎ চশমা খুলে ফেলা অন্ধতাকে নিমন্ত্রণ করার তুল্য। তাঁদের জন্য আমি দুঃখিত। তাঁদের দুঃখ দূর করি, এমন ক্ষমতা আমার নেই।

যাই হ'ক, নাট্যশাস্ত্র আলোচনা করতে হ'লে, সংগ্রহ-শাস্ত্রের চশমা পরতেই হবে। ভরত মুনি অতিশয় বুদ্ধি সহকারে এই চশমাটি নিজেই তৈরী করে দিয়েছেন। ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে যথার্থত নাট্যবিষয়ক আন্তরিক প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে। মুনিরা ভরতকে জিজ্ঞাসা করলেন রস ও ভাব পদার্থ বস্তুত কাকে বলে? আর সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্তই বা কি? প্রশ্নভঙ্গি থেকে বুঝা যায় এর বহু পূর্ব থেকে নাট্যরস ঘটিত আলোচনা নাট্যবিচক্ষণ ব্যক্তিদের সমাজে প্রচলিত ছিল, এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্ত নামে পদার্থগুলি মতভেদসাপেক্ষ সমালোচনার বিষয়রূপে গণ্য হয়েছিল। প্রশ্নপক্ষে রস ও ভাবই প্রথম ও মুখ্য। কিন্তু মুনির উত্তরবচন পক্ষে দেখা যায়, সংগ্রহ ও কারিকাই সর্বপ্রথম সংজ্ঞালক্ষণাকারিত উপদেশের বিষয় হয়েছে। এই দুটি হ'ল সমগ্র নাট্যশাস্ত্র অথবা সংগ্রহ-জালের নাভিস্বরূপ। মনে হয় যেন রস-ভাবের প্রশ্ন ভরতের মনে আন্দোলন সৃষ্টি করার সঙ্গে উপদেশ করার বাসনা হয়েছে। উর্ণনাভ যেমন নাভি থেকে রসক্ষরণ ক'রে জালনির্মাণ আরম্ভ করে, ভরতমুনি সংগ্রহ ও কারিকা রূপ নাভিকেন্দ্র থেকে উপদেশ রস ক্ষরণ আরম্ভ করলেন। সমগ্র নাট্যশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা-লক্ষণপ্রচেষ্টার মধ্যে সংগ্রহ ও কারিকাই হয়েছিল সর্বপ্রথম ঔপপত্তিক বিষয়।

সংগ্রহ অর্থে সাধারণত আহরণ বুঝায়। কিন্তু এস্থলে 'গ্রহ' ধারণার্থে সংগ্রহ হ'ল সম্যক-রূপে ধারণ। লাক্ষণিক অর্থে যাহা দ্বারা সমস্ত উপদেশ বিধৃত হয়, যাহা দ্বারা উদ্দেশ্য ও প্রয়োগবিধি সকলের মুষ্টিবন্ধ গ্রহণ সাধিত হয়, তাহাই 'সংগ্রহ'। নাট্য-গান্ধর্ববিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান সংগ্রহাকারে বিধৃত। সমগ্র উপদেশ সংগ্রহের মুষ্টিবন্ধ।

'কারিকা' অর্থ যাহার মধ্যে কারক-শক্তি আছে। বিধি-নিষ্পাদন সামর্থ্যই কারক-শক্তি।

জ্ঞানজাতীয় পদার্থ সংগ্রহাকারে বিধৃত। বিধৃত বস্তুকে উদ্দেশ্য-বিধেয়াকারে রূপান্তরিত করা ও পরিবেশন করার উপায় হ'ল কারিকা। নাট্যশাস্ত্রের প্রধান অংশের সর্বস্থানে সংগ্রহ-বন্ধন চিহ্ন আছে; কারিকা-প্রণালীও সর্বস্থানে অনুসৃত হয়েছে।

সংগ্রহের লক্ষণনির্দেশ যথা—

বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্র-ভাষ্যয়োঃ।
নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ॥ ৯॥৬ অঃ।

সংগ্রহ রচনার পূর্বে অবশ্যই সূত্র-ভাষ্যজাতীয় রচনা ছিল। উদ্দেশ্যমূলক বহু বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঞ্জনার্থ সকল সূত্র-ভাষ্যের অন্তর্নিহিত ছিল। তদানুষঙ্গিক বিস্তারিত উপদেশও ছিল। ভরত যখন শিষ্যবর্গকে উপদেশ করেছিলেন তখন মুনি ও শিষ্যবর্গ সংগ্রহ-শাস্ত্রের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। কি ভাবে, কি আকারে, কিরূপে সূত্রভাষ্যাদিগত জ্ঞানাবলীকে অভিনব, উপযুক্ত অথচ সংক্ষিপ্ত রূপে আকারিত করা যায়, সেই চিন্তার বশে ভরত সর্বপ্রথমে সংগ্রহ-লক্ষণ প্রতিপাদিত করেছিলেন। নির্গলিত সত্ত সম্পত্তি এই শ্লোকে আবির্ভূত হয়েছে।

'সংগ্রহ' হ'ল সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ (নি, নিশ্চিত রূপে+বন্ধ্ গ্রথণার্থে) বিশেষ পূর্বগ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঐভাবেই 'সংগ্রহ' চিন্তা করেছিলেন। জ্ঞানী অর্থাৎ নাট্য-গান্ধর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি। যেহেতু অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সংগ্রহ-লক্ষণ বিষয়ে অবগত নাও হ'তে পারেন, এবং যেহেতু নাট্য-গান্ধর্বোপদেশ ধারণ-রক্ষণ-প্রচার বিষয়ে পূর্বগ জ্ঞানী ব্যক্তিদের উক্তি সর্বথাস্মরণীয়, অতএব —ভরত তাঁদের উক্তি অনুসারেই সংগ্রহলক্ষণ বর্ণিত করলেন।

প্রশ্ন হতে পারে, সূত্র-ভাষ্যচ্ছলে উদ্দেশ্যমূলক অর্থবিস্তারই যদি ছিল, তাহ'লে, 'সংগ্রহ' নামে নিবন্ধ রচনা বা উপদেশ করার অভিনব প্রয়োজনই বা কি ছিল?

উত্তরে বলা যায়—উদ্দেশ্যমূলক সূত্র, ভাষ্য, ব্যাখ্যাদি ছিল। কিন্তু সূত্র-ভাষ্যাদি উপদেশের মধ্যে বহু-বিভিন্ন প্রয়োগ বিধি বা সংকেতও ছিল একথা মনে করার কারণ নেই। উদ্দেশ্যমূলক তত্ত্বকথা দিয়ে প্রয়োগের দিঙ্‌নির্ণয় হয় না। অধিকন্তু—সূত্রভাষ্যোপদেশের মধ্যে বস্তু-লক্ষণ-বর্ণনার প্রয়াস ছিল না। যথা—সূত্রভাষ্য বাক্যে "বীণাদয়ঃ" শব্দ দ্বারা তন্ত্রীবদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের সূচনা মাত্রই হয়। কিন্তু বীণা, বিপঞ্চী চিত্রা, ঘোষকা, কচ্ছপী প্রভৃতি যন্ত্রের ভেদ ও প্রয়োগ-তারতম্য কিছুই সুস্পষ্ট হয় না। বস্তু পরিচয়বিহীন সূত্রভাষ্য দিয়ে তত্ত্বোদ্ধার হ'লেও কার্যোদ্ধার হয় না। নাট্য ও গান্ধর্ব পরম্পরালব্ধ কর্মাবলী। অতএব সাধ্য কর্মের উপদেশ একান্তই প্রয়োজন। শেষ কথা, সমাজস্থ লোক সাধারণ কি আকাঙ্ক্ষা করে এবং কিরূপ আকাঙ্ক্ষা কিরূপে তর্পণের যোগ্য— এ প্রকার উপদেশও সূত্রভাষ্যাদির মধ্যে থাকার কথা নয়। এক কথায়—'থিওরী' ছিল, 'থিওরেম' ছিল। কিন্তু, "এপ্লায়েড্ আর্ট" বা "এপ্লিকেশন্" সূত্রভাষ্যাদির বিষয়ীভূত ছিল না।

সংগ্রহশাস্ত্র রচনা দ্বারা উক্ত অভাব দূরীভূত করা হয়েছিল। সংগ্রহ শাস্ত্রই প্রবর্তমান নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের সর্বোত্তম ভিত্তি। সংগ্রহ-শাস্ত্রের বিরচন পদ্ধতিই সম্প্রতি আলোচনাস্থল।

অতঃপর, সংগ্রহের অধিকৃত মূল বিষয়গুলি হ'ল সংগ্রহশাস্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ। যথা—

রসা ভাবা হ্যভিনয়া ধর্মবৃত্তিপ্রবৃত্তয়ঃ।
সিদ্ধিঃ স্বরা হতোদ্যং গানং রঙ্গশ্চ সংগ্রহ॥ ১০॥ ৬ অঃ।

সরলার্থ—রসসকল, ভাবসকল, অভিনয়সকল, ধর্ম-বৃত্তি-প্রবৃত্তিসকল, সিদ্ধি, স্বর-সকল, তথাক্রমে আতোদ্য, গান ও রঙ্গ (বিধান) রঙ্গপক্ষে (নাট্যপক্ষে) সংগ্রহ।

সর্বশুদ্ধ এই এগারটি ব্যাপার নাট্যসংগ্রহের উদ্দিষ্ট বিষয়স্তম্ভ। রসসকল অর্থাৎ

শৃঙ্গারাদি অষ্টরস। ভাবসকল অর্থাৎ ৪৯ ভাব (৩৩টি ব্যভিচারী ভাব, ৮টি স্থায়িভাব ও ৮টি সাত্ত্বিকভাব; ৭ম অধ্যায় ১০৬ শ্লোক)। অভিনয় সকল অর্থাৎ বাচিক, আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিকভেদে চারপ্রকার। ধর্ম যথা নাট্যধর্ম ও লোকধর্ম। বৃত্তি কৈশিকভারতী ইত্যাদি চার ভেদ। প্রবৃত্তিসকল, অর্থাৎ অবন্তী দাক্ষিণাত্যা ইত্যাদি ছয় প্রকার। সিদ্ধি দৈবিকী ও মানুষীভেদে দুই প্রকার। স্বরসকল বাক্যোচ্চারণ ভেদে সাতপ্রকার। আতোদ্য অর্থাৎ বাদনীয়যন্ত্র বিষয়ক কর্ম। গান অর্থাৎ কণ্ঠপ্রচেষ্টা। রঙ্গ অর্থাৎ রঙ্গ বিষয়ক যাবতীয় সংগ্রহ ও কর্ম।

এই ১১টি বিষয় নাট্যসংগ্রহে নির্দিষ্ট হয়েছে। যথা, ৬ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে—

এবমেষোঽল্পসূত্রার্থো ব্যাদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ।
* * * * * * * *
॥ ৩১ ॥ ৬ অধ্যায়ে।

অর্থাৎ—৬ অধ্যায়ে ১৫ শেক থেকে ৩০ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকারসূত্র ও অর্থ সমবেত নাট্যসংগ্রহ বিশেষরূপে আদিষ্ট হ'ল।

এই ভিত্তিগুলি পরীক্ষণীয়। রস-ভাবসকল মানসিক ব্যাপার। অভিনয় হ'ল কর্মবিশেষ। ধর্ম হ'ল নাট্যপ্রয়োগের ধারকবস্তু। বৃত্তি হ'ল নাট্যকর্মের সাংস্কারিক চরিত্র। প্রবৃত্তি হ'ল দেশ-কালগত চরিত্র। সিদ্ধি হ'ল নাট্যপ্রয়োগ সমুত্থপ্রভাববিশেষ। স্বর হ'ল উচ্চারণগত ব্যাপার। আতোদ্য অর্থাৎ আতোদ্যপ্রয়োগ বিষয়কর্ম। গান হ'ল লোকবিশ্রুত কণ্ঠকর্ম। এবং রঙ্গ হ'ল প্রেক্ষাগৃহাদিরঙ্গপীঠস্থ যাবতীয় কর্ম।

প্রথম প্রশ্ন—নৃত্ত ও নৃত্য কোথায়, কোন বিষয়াধিকারে? উত্তর 'রঙ্গ' শব্দের অর্থে গীত-বাদ্য-নৃত্ত ও নাট্য সমস্ত ব্যাপার। সুতরাং 'রঙ্গ' বিষয়ের অধিকারে নৃত্ত ও নৃত্যও আছে। তাহ'লে প্রশ্ন হয়—'গান'কে পৃথক বিষয় মনে করার হেতু কি? হেতু এই যে—গান হ'ল কর্ম; বস্তু নয়। গীত হ'ল গানক্রিয়াসমুত্থ বস্তু। অনুরূপ কারণে 'আতোদ্য' বিশেষিত হয়েছে। 'আতোদ্য' অর্থ যন্ত্রবিশেষ; বাদ্য* অর্থে যন্ত্রবাদনসমুত্থ ধ্বনিবিশেষ।

সংগ্রহরূপ শাস্ত্রভূমি নিশ্চিত হ'ল। ভিত্তি-স্তম্ভ রূপ উদ্দিষ্ট বিষয়ও নির্বাচিত হ'ল। অতঃপর, বিষয়গুলি কি প্রকার উপদেশবাক্যে রচিত হবে, সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অল্পাভিধানেনার্থো যঃ সমাসেনোচ্যতে বুধৈঃ।
সূত্রতঃ সা তু বিজ্ঞেয়া কাকাহর্থপ্রয়োগিণী॥ ১১ ॥ ৬ অঃ।

এই শ্লোকে কারিকা নামে রচনা-পদ্ধতি উপদিষ্ট হ'ল। বিশদ অর্থ—"বুধগণ (বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা) অল্পাভিধান (ক্ষুদ্র বাক্য) দ্বারা এবং সংক্ষেপে (সমাস দ্বারা) অর্থ (প্রতিজ্ঞা বাক্যের উদ্দেশ্য) উপদেশ করেন"। ঐভাবে উপদিষ্ট অর্থের (উদ্দেশ্যের) সঙ্গে সেই বাক্যেরই মধ্যে বিধেয় বা প্রয়োগ বিষয়ে উপদেশ থাকে না। এক কথায়, উদ্দেশ্য ও বিধেয় পৃথক ভাবে উপদেশ করাই হ'ল বুধ-বাক্যের নীতি। "কিন্তু (সম্প্রতিবক্ষ্যমানা) কারিকা স্বয়ং সূত্রানুসারতঃ অর্থ-প্রয়োগগর্ভা; ইহাই জ্ঞাতব্য।"

---

* নাট্যশাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'বাদ্য' অর্থ বাদনীয় যন্ত্র নয়; বাদ্য অর্থে সর্বত্রই বাদনসমুত্থধ্বনি অভিপ্রেত হয়েছে। এবং সর্বত্র আতোদ্য অর্থে বাদনযোগ্য যন্ত্র অভিপ্রেত। ইংরাজি অনুবাদ পক্ষে 'গান' হবে "সিঙিং" ("সং" নয়); গীত, গেয়, গীতক, গীতি হবে "সং"; বাদ্য হবে 'মিউজিক্' (মিউজিক্যাল ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট নয়); আতোদ্য হবে মিউজিক্যাল ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট। পরবর্তীকালের সঙ্গীতশাস্ত্রে গান ও গীতি, তথা বাদ্য ও বাদ্য যন্ত্রের ভেদ প্রসাস নেই; একমাত্র "সঙ্গীতরত্নাকর" গ্রন্থ বাদে। যাই হ'ক, এই পর্বের আলোচনা আরম্ভেই পরতাত্ত্বিক চশমা খুলে রাখতে হবে।

বুধ-বাক্যের মধ্যে হয় উদ্দেশ্য, না হয় বিধেয় থাকে। কিন্তু—কারিকা রূপে বিরচিত বাক্যের গর্ভে উদ্দেশ্য ও বিধেয় দুইই নিহিত থাকে। 'তু' শব্দের দ্বারা কারিকার অভিনব বিশিষ্ট সামর্থ্য বা যোগ্যতা সূচিত হয়েছে।

এবং—এস্থলে প্রাসঙ্গিক বিধি-নিষেধের অভাবে বুঝতে হবে, সংগ্রহ ও কারিকা গদ্য বা পদ্য বা উভয়াত্মক হ'তে পারে। এ বিষয়ে পরতন্ত্র গ্রাহ্য নয়।

সংগ্রহ ও কারিকার মধ্যে অভিপ্রেত সম্বন্ধ এই যে সংগ্রহের প্রতিটি বিষয় এক বা একাধিক কারিকার যোজিতরূপে বিরচন কর্তব্য।

সংগ্রহ-শাস্ত্রের আদ্যোপান্তই যে কারিকারূপে রচনীয় এমন নিয়ম নেই। বস্তুত দেখা যায়, সংগ্রহশাস্ত্রের মধ্যে বস্তুপরিচায়ক বহুশ্লোকের মধ্যে যথাযোগ্য সঙ্গতিক্রমে কারিকা যোজিত হয়েছে।

সংগ্রহ-রচনার মধ্যে পারিভাষিক শব্দ নিয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ আছে। পারিভাষিক শব্দ মাত্র দুরকম হ'তে পারে; নিঘণ্টু ও নিরুক্ত। পূর্বে এদু'টি আলোচিত হয়েছে।

নাট্যসংগ্রহে নিঘণ্টু শব্দ সংখ্যায় অত্যল্প। গান্ধর্ব-সংগ্রহে নিঘণ্টু সংখ্যাবহুল। এর একমাত্র কারণ এই যে গান্ধর্ব কর্ম (গীত, বাদ্য, নৃত্ত-বিষয়ক কর্ম) নাট্য প্রচেষ্টা অপেক্ষা প্রাচীনতর। মানবীয় ইতিহাসের সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা করে মনে করা যায়—আদিম মানবের পক্ষে একাকী নাচ-গান-বাজনা যখন সম্ভব হয়েছিল, তখনও সঙ্ঘবদ্ধ নাট্যপ্রচেষ্টা তার কল্পনায় দেখা দেয়নি। নাট্যকর্ম একাকী নিষ্পন্ন হয় না। নির্জনে, বনাঞ্চলে, নদীর ধারে বা পর্বতগুহায় বসে যে গান করে বা বাঁশী বাজায়, সেও নিজের রচিত সুর-লহরী শুনে সুখ ও আত্মতৃপ্তি লাভ করে। একাকী নৃত্তের মধ্যেও কিছু দৈহিক উল্লাস, আত্মগত মোহ ও মানসিক উন্মাদনা থাকে। কিন্তু—যে পরের অনুকরণ করে, সে নিজের অভিনয় দেখতে পায় না। এক কথায়, গীতবাদ্যে নৃত্ত হ'ল অপর ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সদ্য ফলদাতা। অন্যপক্ষে, অভিনয় ব্যাপার সম্পূর্ণ পরিতুষ্টি-সাপেক্ষ। ফল কথা, ইতিহাসের আদিম কালে যে অবস্থায় গীত-বাদ্য-নৃত্ত সংস্কারগত হয়েছিল, সেই অবস্থা থেকে গান্ধর্বের পরিভাষা ও সৃষ্টি হয়েছিল।

অথচ, তখনও হয়ত, অভিনয়-পরিভাষার সৃষ্টি হয়নি। ভারতীয় মানব সমাজের কথাই চিন্তা করা যাক। সেই অবস্থায় সংস্কৃত-বাক্যের প্রয়োগই আরম্ভ হয়নি; ব্যাকরণের কথা ত' চিন্তাই করা যায় না। সেই কাল থেকে অল্পবিস্তর গান্ধর্ব-নিঘণ্টু চলে এসেছিল। প্রসঙ্গত, **"সঙ্গীত-রত্নাকর" প্রণেতা শার্ঙ্গদেব গান্ধর্বকেই অনাদি-সিদ্ধ সম্প্রদায় মনে করেছেন।** নাট্যকে নয়। উক্ত গ্রন্থের টীকাকার কল্লিনাথ টীকা প্রসঙ্গে বলেছেন যে "গান্ধর্ব বেদবদ্ অপৌরুষেয়"*।

---

* সঙ্গীত-রত্নাকর, চতুর্থ প্রবন্ধ্যায়, মূল শ্লোক—

অনাদিসম্প্রদায়ং যদ্ গন্ধর্বৈঃ সম্প্রযুজ্যতে।
নিয়তং শ্রেয়সো হেতু স্তদ্ গান্ধর্বং জগুর্বুধাঃ ॥ ২ ॥

"সম্প্রযুজ্যতে" বলার তাৎপর্য এই যে—শার্ঙ্গদেব মনে করতেন গন্ধর্বগণ সর্বকালেই বর্তমান এবং সর্বকালেই স্বভাব-সিদ্ধ গান্ধর্ব অনুষ্ঠান করেন। শার্ঙ্গদেব ন্যায়সঙ্গত বক্তব্য করেছেন মাত্র। যার আদি বা উৎপত্তি আছে, তার ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু—যা অনাদি তার ধ্বংস কল্পনা করাই যায় না, কারণ, সেই বস্তুর কারণ-সামগ্রীও নিত্য। যাই হ'ক, টীকাকার কল্লিনাথ একটি শঙ্কার নিরসনার্থে স্পষ্ট করে বলেছেন, "অনাদিসম্প্রদায়ত্বম্ ইতি অনেন বেদবদ্ অপৌরুষেয়ত্বম্‌' ইতি সূচিতম্।"

সংগ্রহ-শাস্ত্রে নিঘণ্টুকে "নিগমান্বিতং" বলা হয়েছে। এর অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু—এ স্থলে 'নিগম' শব্দের পক্ষে পরবর্তী কালে কল্পিত তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী অর্থ আরোপ করা অন্যায় হবে। সংগ্রহ-শাস্ত্রে 'আগম' শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এর সমুচিত অর্থও পূর্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ স্থলেও পরতন্ত্রসিদ্ধান্তের চশ্‌মা অচল।

গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে বহু বহু নিঘণ্টু শব্দ আছে। তাদের মধ্যে বাদ্যধ্বনির অনুকার-শব্দগুলি অতীব বিচিত্র। যথা—ধিথ-তিথ, ঘৃঙ, ঘট, ঘেঙ, তাকিট, কিতি-কিটি-কিত্তি প্রভৃতি মৃদঙ্গাদি সমুত্থ ধ্বনি সকল। প্রসঙ্গত, এর মধ্যে অধিকাংশ শব্দই নৃত্তাঙ্গগ্রাহী অনুকার-শব্দ (৩৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শব্দের মধ্যে 'ওঁ'কার যেমন নিঘণ্টু শব্দ, এই অনুকার শব্দগুলিও নিঘণ্টু। কারণে অকারণে যাঁরা মনে করেন, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এক মাত্র 'ওঁ'কার ও জপ-তপ-ধ্যান-সমাধি নিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল, তাঁদেরকে নাট্যশাস্ত্রীয় এই নিঘণ্টু শব্দগুলির কথাও চিন্তা করতে অনুরোধ করি। প্রাচীন মুনি-ঋষিরা একমাত্র জপ-তপাদিতেই মনোনিবিষ্ট ছিলেন না। প্রত্যক্ষ, সুন্দর, চমৎকার বহু বিচিত্র শব্দও তাঁরা অনুভব-শক্তি (অধ্যাত্মপ্রমাণ) দিয়ে আবিষ্কার, সুসংস্কৃত ও ব্যবহারযোগ্য করে গিয়েছিলেন। সে সমস্ত মনুষ্যামুখোচ্ছিষ্ট অমৃত-বিন্দু এখনও গান্ধর্ব-বিদ্যাকে সজীব ও নিত্য নবোন্মেষশালী করে রেখেছে। **বস্তুত, এবং ঐতিহাসিক ভাবে, এই শব্দ সংস্কারের তুলনা জগতে অন্যত্র পাওয়া যায় না।**

নিরুক্ত শব্দের পক্ষে পূর্বেই 'শৃঙ্গার' শব্দটি আলোচিত। অন্য একটি সাধারণ কাব্য-সাহিত্যে প্রচলিত শব্দ দৃষ্টান্ত স্থল করা উচিত মনে করি।

'তুরঙ্গম' শব্দের অর্থ, যাহা বা যে প্রাণী দ্রুতবেগে গমন করে ইতি। সূর্যালোক থেকে বেগবত্তর বস্তু নেই। কিন্তু 'তুরঙ্গম' অর্থে সূর্যালোক নয়। হরিণের গতি অশ্বগতি অপেক্ষাও বেগবত্তর। তা'হলেও তুরঙ্গম অর্থে হরিণ নয়। তুরঙ্গম অর্থে সাধারণ ভাবে অশ্ব। কি হেতু, কোন্ সিদ্ধান্তের বশে? ("ধাত্বর্থহেতুসংযুক্তং নানাসিদ্ধান্তসাধিতম্") যাবতীয় গৃহপালিত ও কার্যসহায়ক প্রাণীর মধ্যে অশ্বই বেগবত্তম। প্রতি অশ্বকেই কি তুরঙ্গম বলা যায়? তা যায় না। প্রাচীন শব্দরহস্যাবলোকনকারী বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিরা ভারবাহী অশ্বকে তুরঙ্গম বলতেন না। কিন্তু—যেহেতু সেনাপতি, মৃগয়াকারী ব্যক্তি, দূত, অথবা রথারূঢ় সারথী দ্রুতগামী অশ্ববিশেষই গ্রহণ করতেন। 'তুরঙ্গম' শব্দের সার্থকতা এই হেতুও সিদ্ধান্তসকলের অনুবর্তী ছিল। আধুনিক কালের তথাকথিত প্রগতিশীল বক্তা বা লেখক (যাঁরা সংস্কৃতকে মৃতভাষা মনে করে পরম তুষ্টি লাভ করেন) হয়ত, ছেকরা-গাড়ির ঘোড়াকেই 'তুরঙ্গম' আখ্যা দিতে ইচ্ছা করবেন, স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের অজুহাতে, অথবা—পরিবর্তনশীল যুগধর্মের মাহাত্ম্যবশে। এ'দেরকে

অর্থাৎ—ভয় নেই, বেদের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়নি। বেদও যেমন অপৌরুষেয়, গান্ধর্বও সে রকম অপৌরুষেয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিত্য পদার্থ যে মাত্র একটিই হ'তে হবে, এমন ত' ন্যায়সঙ্গত অনুমান সাধ্য নয়। যে রকমেই হ'ক, ব্যবহারিক গান্ধর্বের পারিভাষিক নিঘণ্টু শব্দগুলি যে অপৌরুষেয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ ইতিহাস-পূর্ব কাল থেকে এগুলি চলে এসেছে, এবং কেউই বলতে পারেন না যে অমুক নির্দ্দিষ্ট কাল থেকে অমুক অমুক পুরুষ বিশেষেরা ঐ শব্দগুলি উদ্ভাবিত করেছিলেন। এতেও যদি কেউ আপত্তি করেন, তাহ'লে "অপৌরুষেয়" শব্দটির অন্তত মর্যাদা রক্ষা কল্পে বলব, কোনও অজ্ঞেয় অথচ নির্দিষ্ট কালেই গান্ধর্বের ও বেদের উদ্ভব হয়েছিল, তবে, উদ্ভাবক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ পুরুষ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন স্ত্রীলোক!

কেউ সমালোচনা করে নিবারিত করবে না, কারণ পণ্ডশ্রম! কিন্তু এ'দেরই মধ্যে কেউ যদি হাওয়াই জাহাজ বা জেট্-প্লেনকে তুরঙ্গম বলেন, বা যন্ত্র-তুরঙ্গম বলেন, তাহলে—সমালোচনা করেই বলা যাবে, "হে আধুনিক লেখকবর! অনুগ্রহ করে ঐ হাওয়াই জাহাজ বা জেট্-প্লেনটির 'উচ্চৈঃশ্রবা' (সার্থক নাম) অথবা, 'পেগাসস্' নাম করলে, ক্ষীর পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে শর্করা পরিবেশন করার মতোই আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকারক হবে! তাই করুন! ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক ইতিহাসে আপনি পথিকৃৎ বা ক্রান্তদর্শী (আরও ভাল ভাল বিশেষণ আছে, কিন্তু মনে পড়ছে না) লেখকরূপে কীর্তিমান গণ্য হবেন।"

সংগ্রহ-শাস্ত্রের রচনা-পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা যাক। রচনা-বিধির বীজ রয়েছে ৯, ১০ ও ১১ শ্লোকের মধ্যে, অর্থাৎ যথাক্রমে সংগ্রহ-লক্ষণ, নাট্যসংগ্রহের বিষয় ও কারিকা-লক্ষণ এই তিনটি বিষয়ে সারগর্ভ বিবৃতির মধ্যে।

১৪ শ্লোকের মধ্যে নাট্যসংগ্রহ নামে বিশেষিত অংশের প্রসঙ্গ আরম্ভ। এই শ্লোকের অর্থ দ্বারা মূল রচনা-বিধির মর্ম আবিষ্করণীয় নয়; তথা—নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহের সমগ্র রচনাকেও এই শ্লোকের অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় না।

সংগ্রহ-কারিকা রচনা-পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য হ'ল নাট্য ও গান্ধর্ব সম্বন্ধে গুর্বাচারসিদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাগুলিকে শাস্ত্রাকারিতরূপে বিধৃত করে রাখা। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। **কিন্তু—অন্য রকম উদ্দেশ্যও ছিল।** এই উদ্দেশ্য আবিষ্করণীয়।

কারিকাবদ্ধ উপদেশগুলির প্রত্যেকটির সীমাবদ্ধতা ও দৃষ্টিকোণ (পারস্‌পেক্‌টিভ্ অ্যাংগ্‌ল্) আছে। প্রত্যেক কারিকার দৃষ্টিকোণ সরল ভাবে প্রলম্বিত করলে দেখা যায়, প্রলম্ব রেখাগুলি (১) অপর কোনও কারিকার মধ্যে বিলীন হয়েছে; না হয় (২) বিষয়-বস্তু নির্বিশেষে সেই প্রলম্ব কোণ রেখা সংগ্রহের বলয়-রেখার মধ্যে স্থিতি লাভ করে। চিত্রাঙ্কন ঘটিত এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যকে সুগম করা যেতে পারে।

চিত্রাঙ্কনের মূল একটি নীতি হ'ল, যথা, চিত্রকার ব্যক্তি পটের মধ্যে একটি সরল সমান্তরাল রেখাকে আকাশ ও ভূমির সন্ধিরেখা কল্পনা করবেন বা অঙ্কিত করবেন। অতঃপর, চিত্রের বিষয়ীভূত যাবতীয় বস্তুর বহিঃ রেখাসমুখ দৃষ্টিকোণগুলি এমনভাবে ব্যবস্থিত হয় যাতে ক'রে প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রলম্ব-কোণ-রেখা পূর্বোক্ত দিগ্‌বলয়রেখার (স্কাই লাইন্) মধ্যে পর্যবসিত হ'তে পারে। এরই ফলে, সেই পটের অধিকৃত বস্তুগুলির সুসমঞ্জস সুস্থিতি পরিস্ফুট হয়। মূলে এই নিয়মের অপালনে চিত্রযোগ্য বস্তুগুলির সমঞ্জস স্থিতি ব্যাহত হয়। একটি নির্দোষ চিত্রের চিত্রকর ব্যতীত অপর কোনও দুঃসাহসী লোক নূতন বিষয়বস্তু প্রক্ষেপের চেষ্টা করলে প্রায়ই দেখা যায়, **উৎক্ষিপ্ত বস্তুর দৃষ্টিকোণের সঙ্গে বলয়-রেখার যোগ ঘটেছে না। চিত্রবিদ্যা-বিশারদ প্রেক্ষক এই হীন-যোগ বা অযোগ অনায়াসেই বুঝতে পারেন।** যাই হ'ক—চিত্রাঙ্কনের মধ্যে এরকম দোষ ঘটে গেলে, কোনও বর্ণসমৃদ্ধি বা বিষয়মাহাত্ম্য দিয়ে ঐ দোষ প্রচ্ছাদন করা যায় না। । অন্ততঃ যথার্থ সমালোচন দৃষ্টিকে প্রবঞ্চিত করা যায় না।

অনুরূপ ভাবে, বলা যায় নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহের ভিত্তি-স্তম্ভগুলি সমগ্র সংগ্রহ-শাস্ত্রের (অর্থাৎ বিরাট জটিল রচনা-চিত্রের) সাক্ষাৎ দিগ্‌বলয়রূপে প্রতিভাত। যাবতীয় কারিকার দৃষ্টিকোণ প্রলম্বিত করলে দেখা যায়, সমস্তই পরস্পর-সম্বন্ধী অন্বয়ের মাধ্যমে মূল বলয় রেখায় পর্যবসিত হয়। এই বলয়-রেখা বা সংগ্রহ-রেখার সঙ্গে বহুদূরান্বিত বহু বিচিত্র কারিকার্থের যোগ-সম্বন্ধ অনুশীলন করতে করতে অকস্মাৎ একটি কারিকার মধ্যে সম্বন্ধহীন অর্থ বিজ্ঞাপিত হয়েছে দেখলেই সন্দেহ হওয়া উচিত, এই সম্বন্ধবর্জিত কারিকাটি প্রক্ষিপ্ত কি না। অতঃপর, ঐ

কারিকাগর্ভস্থ অর্থ বা প্রয়োগবিধির সঙ্গে যদি দেখা যায় যে নিকটস্থ বা দূরস্থ অপর অর্থ-প্রয়োগের সম্বন্ধ নেই, অধিকন্তু, সন্দিগ্ধ কারিকার দৃষ্টিকোণ মূল সংগ্রহ-রেখার মধ্যেও পর্যবেশিত হয় না, তা'হলে এই সন্দিগ্ধ কারিকাটি যে প্রক্ষিপ্ত এ বিষয়েও সন্দেহ থাকে না।

এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করা যায়, কোনও প্রক্ষেপকারী লেখক সংগ্রহ-শাস্ত্রের চশমা ব্যবহার না করে, কোনও পরতন্ত্রসিদ্ধান্তকে সংগ্রহ-শাস্ত্র বা নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে প্রক্ষেপ করেছেন।

ফল কথা, সংগ্রহ-কারিকার রচনাগত সম্বন্ধ বিশুদ্ধ রূপে জানা থাকলে, পরবর্তীকালের মাধ্যমিক ও তৃতীয় সম্পাদকবর্গ কোন্ কোন্ স্থানে সদোষ প্রক্ষেপ করেছেন, তা'ও পরীক্ষা করে আবিষ্কার করা যায়।

প্রক্ষেপ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করা যেতে পারে।

প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৯শ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকের পরে গদ্যাংশ যথা—

"পাঠ্যগুণান্ ইদানীং বক্ষ্যামঃ।"

এস্থলে পাঠ্যগত (বাচিক অভিনয়ের বাক্যোচ্চারণগত) গুণসকলই প্রসঙ্গ; গীত-বাদ্যগত স্বরবস্তুর প্রসঙ্গ নয়। এর পরেই,—"সপ্তস্বরাঃ ত্রীণি স্থানানি" ইত্যাদি বিষয়স্থাপনা। এস্থলে "সপ্তস্বরাঃ" অর্থ গুণস্বর; যথা উদাত্ত, অনুদাত্ত ইত্যাদি। গীতবাদ্যগত ষড়্‌জাদি স্বরগুলি হ'ল বস্তুস্বর; গুণস্বর নয়*।

অতঃপর, উদ্দিষ্ট "সপ্তস্বরাঃ" প্রসঙ্গ বিস্তার করে বলা হয়েছে—

"তত্র সপ্তস্বরাঃ ষড়জর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষধাঃ। এতে রসেষু উপপাদ্যাঃ যথা—"

এস্থলে, "তত্র সপ্তস্বরাঃ" পর্যন্ত বাক্য বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য। কারণ—ঐ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোক থেকে ৪৩ শ্লোক পর্যন্ত কারিকায় স্থান-বর্ণ ভেদে (তিনটি স্থান ও চারটি বর্ণ) সাতটি বা সাত রকমের গুণস্বর উপদিষ্ট হয়েছে। এবং—"ষড়জর্ষভ" ইত্যাদিও "রসেষু উপাপাদ্যাঃ যথা" ইত্যন্তঃ পর্যন্ত সমস্ত বাক্যটি প্রক্ষেপ। প্রক্ষেপকারী অবহেলা করেছেন; (ক) পাঠ্যগুণান্ শব্দের অর্থ, গুণান্ শব্দের অর্থ; (খ) "সপ্তস্বরাঃ" বাক্যে স্বরের অর্থ গুণস্তর, যথা উদাত্তানুদাত্তাদি চার, ও ত্রিস্থানগত তিন, ইতি সাত রকমের গুণস্বর। "সপ্তস্বরাঃ" অর্থ বুঝতে না পেরে তিনি গান্ধর্বসংগ্রহের* অধিকৃত ষড়জ-ঋষভাদি বস্তু স্বরের তত্ত্ব এস্থলে প্রক্ষিপ্ত করেছেন। কিরূপ প্রমাণ সামর্থ্যে প্রক্ষেপ করলেন? কোন বেদার্থব্যাখ্যাতা বা ন্যায়ব্যাখ্যাতার কৃত সিদ্ধান্তের অনুগামী হয়ে।

ব্যাপারটি উৎক্ষেপ মনে করা যায় না। কারণ, উৎক্ষিপ্ত বস্তুকে পুনর্বার স্বস্থানে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। ২২ অধ্যায়ের প্রারম্ভে মধুকৈটভাসুর-বধ প্রসঙ্গ তথা—ভগবান বিষ্ণুর শিখাপাশ বন্ধন সংকেত দিয়ে "কৈশিকী" নাম বৃত্তির উৎপত্তি কাহিনী সদোষ প্রক্ষেপ। প্রক্ষেপকারীর দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল "কেশ" ও "কৈশিকী" শব্দের অর্থ-কল্পনার মধ্যে। ভগবান বিষ্ণু সংগ্রামের পূর্বে শিখাপাশ বন্ধন করেছিলেন। "শিখা" কেশের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং—বিষ্ণুর

---

* নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ভাষ্যে-টীকাকারগণ এই গুণস্বর ও বস্তুস্বরের ভেদ না বুঝে অনর্থক মীমাংসক সম্প্রদায়ের ভাষ্য-টীকাকারগণের সঙ্গে শব্দ-স্বরতত্ত্ব বিষয়ে বাগ-বিতণ্ডা করেছেন। এখনও পর্যন্ত আধুনিক বেদার্থগবেষকগণ উদাত্ত-অনুদাত্ত প্রভৃতি উচ্চারণসমুত্থ গুণস্বর ও গানবাদনসমুত্থ ষড়জাদি বস্তুস্বরের পার্থক্য না বুঝে নানা রকম মনঃকল্পিত টীকা-ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন।

* ২৯ শ অধ্যায়, ১২, ১৩ ও ১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য

শিখাপাশ বন্ধন দর্শন করে ব্রহ্মা কৈশিকীবৃত্তি নামকরণ করলেন। গল্প রচনা করতে দোষ নেই; কিন্তু প্রক্ষেপ আপত্তিজনক। কারণ— (১) ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত কৈশিকীবৃত্তির পরিকল্পনার সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই। সেস্থানে বলা হয়েছে—"কৈশিকী শ্লক্ষ্মনৈপথ্যা শৃঙ্গাররসসম্ভবা" (৪৬ শ্লোক); (২) ব্রহ্মার মানসসৃষ্ট মঞ্জুকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরোগণ কৈশিকীর উত্তম আধার (৪৭ শ্লোক;) (৩) ১৪ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকের পর গদ্যাংশের শেষের দিকে বিবৃতি যথা—"তত্র দাক্ষিণাত্যাঃ তাবৎ বন্ধনত্ত্তগীতবাদ্যা কৈশিকীপ্রায়াঃ চতুরমধুরললিতাঙ্গাভিনয়াশ্চ।"; এবং (৪) ২২ অধ্যায়ে কৈশিকীবর্ণনা যথা—

যা শ্লক্ষ্মনেপথ্যাবিশেষচিত্রা, স্ত্রীসংযুতা যা বহুনৃত্তগীতা।
কামোপভোগপ্রভবপ্রচারা, তাং কৈশিকীং বৃত্তিমুদাহরন্তি ॥ ৪৭ ॥

এই চারটি কারিকার সঙ্গে উক্ত গল্পবর্ণিত কৈশিকীর কিছুমাত্র সঙ্গতি নেই। কৈশিকীবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধকর্মের সম্বন্ধ নেই, এবং থাকতে পারে না। কারণ 'আরভটি' বৃত্তির সঙ্গেই যুদ্ধের ভাব-কর্মসাধনের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে (২২ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোক থেকে ৬৩ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে)। এতৎ সত্ত্বেও প্রক্ষেপকারী সংগ্রামেচ্ছু বিষ্ণুর শিখাপাশ বন্ধন ব্যাপারকে কৈশিকীর উদ্‌ভব-হেতু মনে করেছিলেন। এ পক্ষে দু'রকম কারণ থাকতে পারে। প্রথম—কোনও অলঙ্কারশাস্ত্রে হয়ত বৃত্তিপ্রসঙ্গে উক্ত উদ্‌ভট কাহিনী স্থান লাভ করেছিল। অথবা দ্বিতীয়—নাট্যশাস্ত্রে ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ইঙ্গিত হয়নি। প্রক্ষেপকারী হয়ত বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। তিনি "কৈশিকী" শব্দটি উপলক্ষ্য করে ভগবান বিষ্ণুকে পরমশ্রদ্ধাপূর্বক সংগ্রহশাস্ত্রের মধ্যে সম্মানসূচক আসন দিলেন; যথা—ভগবান বিষ্ণুর লীলা থেকেই যাবতীয় বৃত্তির উদ্‌ভব।

প্রসঙ্গত, গল্প দিয়ে সর্বক্ষেত্রে কার্যোদ্ধার হয় না; এটি তার দৃষ্টান্ত। আবার, গল্প-কাহিনীকে কারিকা-দিগ্‌দর্শনীর অনুকূলে প্রবর্তিত করে, অর্থ ও প্রয়োগসূচিত করার দৃষ্টান্তও আছে; নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে। সে স্থলে প্রক্ষেপ হয়েছে মনে করা যায় না।

নাট্যসংগ্রহের মধ্যে উক্ত দু'টি প্রক্ষেপ হ'ল বৃহত্তর প্রক্ষেপ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য প্রক্ষেপও আছে। কিন্তু, এস্থলে প্রসঙ্গ বিস্তারের প্রয়োজন নেই।

গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে সদোষ প্রক্ষেপের দৃষ্টান্ত সংখ্যায় অধিক এবং অধিকতর বিড়ম্বনাকারক।

প্রথম দৃষ্টান্ত। ২৮ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকের পর গদ্যাংশের মধ্যে চতুর্থ বাক্য, "যথা ন্বে বীণে" ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে ৩১ শ্লোকের অব্যবহিত পূর্বে সমাপ্তিবাক্য "চতুর্বিধঃ চতুর্দশমূর্চ্ছনাঃ।" ইত্যন্তঃ বিরাট অংশটি সদোষ প্রক্ষেপ। এরূপ সিদ্ধান্ত পক্ষে হেতু এই যে (ক) কারিকা প্রয়োগের নামগন্ধও নেই, ও (খ) ২৮ অধ্যায়ে গান্ধর্ব-সংগ্রহের বিষয়ক্রমিক নিদর্শন (১৯ শ্লোক থেকে ২২ শ্লোক পর্যন্ত পদ্য-গদ্য স্তর) অন্যন্যায়ী শ্রুতি-গ্রাম বিষয়ে যে কারিকাগত সিদ্ধান্ত সঞ্চারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই কারিকাসকল তথা গান্ধর্বের সংগ্রহ-বলয়রেখার সঙ্গে এই উপদেশাবলীর মিলন ত' নেই, বরং বিরোধই আছে। এই উপদেশাবলী কোনও পরতন্ত্রসিদ্ধান্ত রূপে এস্থলে প্রক্ষিপ্ত। অবশ্য, প্রক্ষেপের কারণ আছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। ঐ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকের পরে গদ্যাংশ "দ্বিবিধা একমূর্চ্ছনা সিদ্ধিঃ।" ইত্যাদি থেকে "অন্তরদর্শনং অপি শ্রুতিনিদর্শনে প্রোক্তম্।" ইত্যন্তঃ পর্যন্ত গদ্যান্তর সদোষ প্রক্ষেপ। কারণ সংক্ষেপে (ক) গান্ধর্ব-সংগ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ বর্জিত, ও (খ) ঐ পর্যন্ত কারিকার সঙ্গে সিদ্ধান্তবিরোধ।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত। পুনরায় পরবর্তী গদ্যান্তরে "তত্র একোনপঞ্চাশৎ ষট্‌স্বরাঃ" ইত্যাদি থেকে "এবং এতে একত্রগম্যমানাশ্চতুরশীতিঃ ভবন্তি।" পর্যন্ত সদোষ প্রক্ষেপ। পুনরায়, ঐ একই গদ্যান্তরে "দ্বিবিধাস্তানক্রিয়া তন্ত্র্যাম্" ইত্যাদি থেকে "নিগ্রহঃ প্রবেশো বা" ইত্যন্তঃ পর্যন্ত গদ্যাংশ সদোষ প্রক্ষেপ। কারণ, সংক্ষেপে, পূর্ববৎ।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত। ঐ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকের পরে গদ্যাংশ "এতাসাং অষ্টাদশানাং" ইত্যাদি থেকে সমগ্র গদ্যস্তরটি সদোষ প্রক্ষেপ।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত। ঐ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোক থেকে ৭০ শ্লোক পর্যন্ত বৃহৎ পদ্যস্তর সদোষ প্রক্ষেপ।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ঐ অধ্যায়ে ৭২ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ "মন্দ্রশুতারবিষয়া পঞ্চস্বরপরা গতিঃ।" বাক্যাংশটি উৎক্ষেপ।

সপ্তম দৃষ্টান্ত। ঐ অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোক থেকে অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক (১৪১ শ্লোক) শ্লোক পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত। এই প্রক্ষিপ্তাংশ বহুদোষদুষ্ট। তার সামান্য প্রমাণ এই যে—অধ্যায়ের সমাপ্তিস্থলে গদ্যবাক্য যথা—"ইতি ভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্রে আতোদ্যবিধির্নাম অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ।" অথচ—এই সমগ্র অধ্যায়ে আতোদ্য-বিধির নাম গন্ধও নেই। পুনশ্চ—"আতোদ্য বিধি" নাট্য-সংগ্রহেরই অধিকৃত। কিন্তু—এই অধ্যায় প্রত্যক্ষত গান্ধর্ব-সংগ্রহেরই অধিকৃত।

অষ্টম দৃষ্টান্ত। ২৯ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক থেকে পর্যন্ত সদোষ প্রক্ষেপ।

গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে উক্ত আটটি সদোষ প্রক্ষেপ সতর্কতাপূর্বক আবিষ্করণীয় ও বিচার্য। বিচার-পদ্ধতি পরে সংগতিক্রমে আলোচ্য। প্রক্ষিপ্ত কিয়দংশের মূল আধারও আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে মূল আধার এতাবৎ কাল পর্যন্ত অজ্ঞাত। প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে কিছু না কিছু সার আছে। কিন্তু—সেই সারাংশেরও নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহে যথান্যায় স্থান নেই। যেমন, কাব্যাদর্শগত অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে মনোবিজ্ঞান ও ভাব-বিজ্ঞানের স্থান আছে, কিন্তু—মোক্ষ-তত্ত্বান্বিষ্ব ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, জীবব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মের স্থান নেই; কারণ, এই শেষোক্ত বিষয়-গুলি মোক্ষ-তত্ত্ব নামে প্রস্থান ভেদের অধিগত, এবং কাব্য-রসের সঙ্গে মোক্ষের সম্বন্ধই* নেই।

পুনশ্চ—যেমন শ্রব্যগত গান্ধর্ব, শ্রব্যদৃশ্যগত নাট্য, দৃশ্যগত চিত্রবিদ্যা, দৃশ্য-স্পর্শ্যগত ভাস্করবিদ্যা, রূপ-রস-স্পর্শ-আঘ্রাণগত পাকবিদ্যার সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধ নেই, সেরূপ—নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহের সঙ্গে উক্ত প্রক্ষিপ্ত বস্তু সকলের সম্বন্ধ নেই। অতঃপর—

পল্লবাংশে প্রক্ষেপের দৃষ্টান্ত

প্রথম দৃষ্টান্ত। ৩৩ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক থেকে ১০ শ্লোক পর্যন্ত একটি কবন্ধ-সদৃশ কাহিনীর যোজনা সদোষ প্রক্ষেপ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। ৩৪ অধ্যায়ের ৭৭ ও ৮৮ শ্লোক এবং ৭৯ শ্লোকের প্রথম দু'ই চরণ প্রক্ষিপ্ত।

সংক্ষেপে, নাট্যশাস্ত্রের কাণ্ডপল্লবাংশের মধ্যে উক্ত ১২টি বৃহদাকৃতি প্রক্ষেপ আবিষ্করণীয়। **সংগ্রহ-কারিকা মিলিত রচনা-পদ্ধতি দ্বারা যে কৌশলে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বিধেয় কবলিত হয়েছে, সেই কৌশলের প্রতি নিরন্তর অবহিত থাকলে** অনুশীলক ব্যক্তি প্রক্ষেপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। নচেৎ নয়।

---

* জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিলেই যে বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভবনা চিরকালের জন্য বাধিত হয়, এমন নিশ্চয়তা নেই; অথবা—তেল—জল ঝাঁকিয়ে ঘোলা তৈরি করলেই যে মিলনটি অন্তহীন হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। সেই রকম আর কি।

গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে প্রক্ষেপের কারণ

সর্বাধিক প্রক্ষেপ ঘটেছে গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে। নিম্নলিখিত কারণগুলি অনুসন্ধেয়—

(১) গান্ধর্বের ঐতিহ্য নাট্য-ঐতিহ্য থেকেও সুপ্রাচীনতর। ফলে গান্ধর্ব-শিল্প-বিজ্ঞানের পরিভাষা নিঘণ্টু শ্রেণীর শব্দ বিষয়ে সমৃদ্ধতর। কিন্তু—নিঘণ্টু লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে, পরবর্তী কালে বহু মতভেদ ও বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল। এরূপ বহু সম্প্রদায় দাবী করতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় গান্ধর্ব-সম্পদের উত্তরাধিকারী।

(২) নাট্য-ঐতিহ্য পক্ষে, পরবর্তী কালে রচিত অপর কোনও সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র বা শাস্ত্রকার সম্বন্ধে **প্রমাণসই পরিচয় পাওয়া যায় না।** নাট্য-ঐতিহ্য পক্ষে শাখা-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বসূচক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু—গান্ধর্ব বা গীত-বাদ্য-নৃত্ত ব্যাপারাশ্রিত বিভিন্ন মতাবলম্বী শিল্পবিদ্যা বা চারুকলার অস্তিত্বের, তথা সম্প্রদায়ক-ধারক বহু খ্যাতনামা পুরুষের নাম, এমনকি, প্রকীর্ণ রচনার সাক্ষ্য আছে। যথা, নন্দীকেশ্বর, শার্দুল, কোহল, যাষ্টিক কাশ্যক, মতঙ্গ, বিশাখিল, দত্তিল প্রভৃতি গান্ধর্ববেত্তা পুরুষগণ। মহাভারতে "বহুগান্ধর্ব-দর্শনা" জনৈক রাজকুমারীর উল্লেখ দৃষ্টে অনুমান হয় বহু বিভিন্ন মতাবলম্বী গান্ধর্ব উদ্ভূত হয়েছিল। মতঙ্গপ্রণীত "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে বহু গান্ধর্ব-মতের উদ্ধৃতি আছে।

(৩) গান্ধর্ব-সংগ্রহের প্রারম্ভিক অনুশীলনা করলে দেখা যায়—সংগ্রহ-বিষয়ের নাম-ক্রমের মধ্যেই বিপর্যয় প্রবেশ করেছে। যাকে বলে, "সরষের মধ্যে ভূত।" এ পক্ষে, কা-সং ও চৌ-সং * উভয়ই ন্যূনাধিক বিপর্যস্ত।

সুতরাং অনুশীলকের পক্ষে **নামোদ্দিষ্ট** (নাম দ্বারা লক্ষিত) বিষয়গুলি পরে বিস্তারিত কারিকাবন্ধ উপদেশগুলির মধ্যে থেকে অতি সন্তর্পণে অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও উদ্ধার ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

যে পক্ষে নামোদ্দেশ পাওয়া যায়, অথচ, কারিকাবন্ধ উপদেশ পাওয়া যায় না, সে স্থলে সেই নামোদ্দেশকে সংক্ষেপে **নষ্টোদ্দিষ্ট বিষয়,** বা **'নষ্টোদ্দিষ্ট'** বলব (ইং ellipsis)। এবং—যে ক্ষেত্রে উদ্দেশ পাওয়া যায়, অথচ—কারিকা-উপদেশ অসম্পূর্ণ বা ভগ্নাবস্থ, সে স্থলে সেই উদ্দেশকে **ভগ্নোদ্দিষ্ট** বলব। এ ব্যাপারকে ভগ্নকারিকা বলে লাভ নেই। কারণ, উদ্দিষ্ট বিষয় ও কারিকার মধ্যে একটি প্রত্যাশিত শুভ সম্বন্ধ আছে। **এই সম্বন্ধটি সংগ্রহমুখী;** কারিকার মধ্যেই সংগ্রহ-বীজের আধার; সংগ্রহের নিমিত্তই কারিকা; কারিকার নিমিত্ত সংগ্রহ নয়। কারিকা ভগ্ন হ'লে মূল উদ্দিষ্ট বা বীজেরই ক্ষতি হয়। বীজ-ক্ষতিই প্রধান; আধার-ক্ষতি গৌণ। পুনশ্চ—কারিকা ভগ্ন হ'লেও সেই কারিকাই হয়ত প্রক্ষিপ্ত। অতএব উদ্দিষ্ট বিষয়েরই মাহাত্ম্য।

এখন, নষ্টোদ্দিষ্ট ও ভগ্নদ্দিষ্টের ছিদ্র পথেই সদোষ প্রক্ষেপের প্রবেশ সম্ভব। গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে এ রকম ছিদ্র ছিল বলেই তৃতীয় **সম্পাদকবর্গ** সদোষ প্রক্ষেপ করতে সাহসী হয়েছিলেন। প্রক্ষেপ একবার পুঁথিগত হ'লে আর ত' রক্ষা নেই! প্রচলিত দৃষ্টান্ত যথা পাণ্ডুলিপির মধ্যে 'সূত্র' শব্দস্থলে একবার "মূত্র" শব্দ অনুপ্রবেশ করলে ক্রমান্বয়ে পাণ্ডুলিপিকারেরা মূত্র শব্দই গণ্য মনে করেন। তাঁদের কর্তব্য এই পর্যন্ত। প্রকরণ ও সঙ্গতি না বুঝে 'সূত্র' স্থলে 'মূত্র' প্রয়োগ করা, এবং সংগ্রহের উদ্দিষ্ট না বুঝে একটি, বা দশটি বা বহুতর শ্লোক

* চৌ-সং ২৮ অধ্যায় ১০ শ্লোক থেকে ১৮ শ্লোক; কা-সং ২৮ অধ্যায় ১০ শ্লোক থেকে ২১ শ্লোক পর্যন্ত অংশ।

প্রক্ষেপ করা একই কথা

গান্ধর্ব-সংগ্রহে নষ্টোদ্দিষ্টের ছিদ্র পথে কিভাবে ও কত প্রকার প্রক্ষেপ প্রবেশ করেছিল, তাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ আলোচনা করব।

২৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে ক্রমাগ্রসর উপদেশরূপে স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, মূর্চ্ছনা (দ্বিবিধ), সাধারণ, এই পাঁচটি সংগ্রহোদ্দিষ্ট বিষয়ে যথোপযুক্ত গদ্য-পদ্যাশ্রিত কারিকা পঠিত আছে। এর পরেই "অষ্টাদশ-জাতি" উদ্দিষ্ট। ৩৫ শ্লোকের পরেই গদ্যোপক্রমণিকা যথা—"জাতিং ইদানীং বক্ষ্যামঃ।" অর্থাৎ—"এখন অবসরক্রমে জাতি-তত্ত্ব ও প্রয়োগ-রহস্য উপদেশ করব।" এর পরেই একটি শ্লোকগুচ্ছ। এই শ্লোকগুচ্ছের সর্বশেষ শ্লোক হ'ল

জাতয়োঽষ্টাদশেত্যেব যা পূর্বং গদিতা ময়া।
তাস্ত্বহং সম্প্রবক্ষ্যামি ন্যাসোপন্যাসসংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥ ২৮ অঃ।

এর অর্থ যথা—পূর্বেই যে অষ্টাদশ জাতির প্রসঙ্গ করেছি (সংজ্ঞা, সামান্য লক্ষণ, বিশেষ লক্ষণ ও গ্রহ-অংশগত লক্ষণ বর্ণনারূপে) সেই অষ্টাদশ জাতির পক্ষে (ন্যাস-উপন্যাস প্রয়োগ বলা হয়নি বলে) এখন, মাত্র ন্যাস-উপন্যাস-প্রয়োগ লক্ষিত ব্যাখ্যা করব।

'তু' শব্দের সূচনা দ্বারা উক্ত একমাত্র অর্থই গ্রাহ্য।

কিন্তু—দুঃখের বিষয়, জাতি সংজ্ঞা প্রভৃতি যাবতীয় প্রত্যাশিত বিবৃতি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ—"জাতিং ইদানীং বক্ষ্যামঃ" বাক্য দ্বারা যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা হ'ল; তার নিবৃত্তির নিমিত্ত কোন অর্থ বা উপদেশ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০. ও ৪১ শ্লোকে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু—এই পাঁচটি শ্লোকের অন্তর্নিহিত বিবৃতি, গান্ধর্ব-সংগ্রহের পূর্বোপদিষ্ট তত্ত্বের অনুকূলে অর্থ প্রকাশ করে না। **সুতরাং—এই পাঁচটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।** পূর্বোপদিষ্ট স্বর-শ্রুতি ইত্যাদি পাঁচটি উদ্দিষ্ট বিষয় থেকে যে সকল বস্তু-লক্ষণ, বস্তু-পরিচয় ও বাস্তব-প্রয়োগঘটিত সিদ্ধান্ত সম্ভব,—সে সকল বস্তু-লক্ষণ প্রভৃতির অবিরোধে এই পাঁচটি শ্লোকের ব্যাখ্যা অসম্ভব।

অতএব—সাধারণ অথচ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে—অষ্টাদশ-জাতি নামে সংগ্রহোদ্দিষ্ট বিষয়টি নষ্টোদ্দিষ্ট।

এই যে অবকাশ সৃষ্টি হ'ল, এর মধ্যে কি পরিমাণ ও বিচিত্র প্রক্ষেপ পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া উচিত।

প্রক্ষেপ-পরিচয়

(১) অষ্টাদশ জাতির গ্রাম-লক্ষণ। এ বিষয়ে বহু পরস্পরবিরোধী বিবৃতি আবির্ভূত।

(২) জাতির নয়, কিন্তু অষ্টাদশ-জাতির শুদ্ধা-বিকৃতা-শুদ্ধাবিকৃতা ইতি শ্রেণীর উল্লেখ। উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, বিধি অনুপদিষ্ট।

(৩) অষ্টাদশ জাতির প্রসঙ্গে মাত্র অংশ-স্বর ব্যবস্থা বিষয়ে প্রচুর শ্লোকগুচ্ছ আছে। কিন্তু—তদন্তর্গত শ্লোকগুচ্ছের মধ্যে অনপনেয় সিদ্ধান্ত-বিরোধ আছে।

(৪) জাতিগুলির ঔডুব-ষাড়ব-সম্পূর্ণত্বের বিবৃতি আছে। ঔডুব অর্থ পঞ্চস্বরা অবয়ব; ষাড়ব অর্থ ষটস্বরা অবয়ব; সম্পূর্ণ অর্থ সপ্তস্বরা অবয়ব। কিন্তু—যথার্থত উদ্দেশ্য-বিধেয় লক্ষণাক্রান্ত একটিও কারিকা নেই। যিনি বা যাঁরা এ রকম প্রক্ষেপের কর্তা, তিনি বা তাঁরা সংগ্রহ কাকে বলে, আর কারিকা কাকে বলে, এসব কথা জানতেন না।

৩৬ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে, অধ্যায়-সমাপ্তি ১৯১ শ্লোকের মধ্যে মাত্র ৪৩ ও ৪৪ শ্লোকের ন্যায়সংগত অর্থ উদ্ধার করে বলা যায়, এদুটি শ্লোক ভরত মুনির অভিপ্রেত অষ্টাদশ জাতি বিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং—৭১ শ্লোক ও ৭২ শ্লোকের কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহ ও অংশের

সংজ্ঞা লক্ষণ প্রকাশ করে।

অষ্টাদশ-জাতি বিষয়ে সমগ্র বিবৃতি ধীর ভাবে অনুশীলন ও পর্যালোচনা করে ন্যায্য অনুমান হয়—(ক) অষ্টাদশ-জাতি নষ্টোদ্দিষ্ট (খ) মাধ্যমিক সম্পাদনার পূর্বেই ঐ অবস্থা ঘটেছিল, (গ) মাধ্যমিক ও তৃতীয় সম্পাদকবর্গ গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে পরতন্ত্রগ্রাহ্য মত, বিবৃতি ও সিদ্ধান্ত প্রক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ—"বিশল্যকরণী" ভেষজ যখন চেনা যাচ্ছে না, তখন গন্ধমাদন পর্বতের সমস্ত ঔষধিবর্গ আহরণ করে স্তূপীকৃত করা যাক; ইতি লোকায়ত ন্যায়।

নষ্টোদ্দিষ্টের পুনরুদ্ধার

পুনরুদ্ধার কি সম্ভব? আমার মতে, সম্ভব। কিরূপে সম্ভব? গান্ধর্ব-সংগ্রহের স্বর-বিধান, গ্রাম, শ্রুতি, মূর্চ্ছনা ও সাধারণ, এই কয়টি থেকে নির্গলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—জাতি নামে বস্তু-তত্ত্বে উপনীত হওয়া সম্ভব। কারণ, —প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত অঙ্কশাস্ত্র সিদ্ধ সংখ্যা দ্বারা সুনিবৃত্ত। এর মধ্যে ভাব-কল্পনা, মনঃ কল্পনা প্রবেশ করতে পারে না। সাত স্বর, বাদী-সংবাদী প্রভৃতি শ্রুতিযোগ ও স্বর-সম্বন্ধ, বাইশ-শ্রুতি, দুই গ্রাম, চৌরাশী মূর্চ্ছনা ও সংখ্যা-নিবৃত্ত সাধারণ-স্বর,—এ সমস্তই সংখ্যা-জালবদ্ধ বস্তু-পরিচয়। প্রত্যেকটি সংখ্যা-নিষ্পত্তি চরম ও মতভেদাবকাশরহিত।

এতৎ সমস্ত সিদ্ধান্ত বিষয়ক "মুমেণ্টাম্" সংগ্রহ করে, এবং সেই নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের সঙ্গে শৃঙ্গার-রস (সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ পৃথকভাবে) প্রভৃতি রস-যোগতত্ত্ব বিনিয়োজিত করলে পরিপূর্ণ ও অনূন-অনধিক অষ্টাদশ-জাতি গঠিত করা সম্ভব হয়েছে*।

প্রসঙ্গত, একথাও বলতে পারি যে—শৃঙ্গারাদি রস-বিনিয়োগতত্ত্ব (যা ভরতমুনির ও গান্ধর্বের অভিপ্রেত) বর্জন করেও মাত্র ন্যায়সঙ্গত ও অঙ্কশাস্ত্রসম্বল "সাধারণ" "জাতি" ও "উপজাতি" নামে বস্তুলক্ষণলক্ষিত শ্রেণীবিভাগ দ্বারা অষ্টাদশ-জাতির রূপ-লক্ষণাদি উদ্ধার করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে কেউ মনে করতে পারেন যে জাতির সঙ্গে রস-বিনিয়োগ মাত্র কাকতালীয় ব্যাপার বা মনঃকল্পনা। কিন্তু ভরতমুনি সেরূপ মনে করেননি বলেই সংগ্রহ-শাস্ত্রের মধ্যে (নাট্যশাস্ত্রের ২৯ অধ্যায়) রস-জাতিতত্ত্বের দিগ্‌দর্শনী প্রকাশিত করেছেন। প্রক্ষেপ বর্জন করে সারবান মূল পদার্থ ঐ দিগ্‌দর্শনী উদ্‌ভাসিত করে।

অতঃপর—সংগ্রহ-কারিকা বিরচন পদ্ধতির অপরাপর সুবিধা সুফলের প্রসঙ্গ।

সার কথা এই যে প্রজ্ঞাবান ও বহুদ্‌রদর্শী ভরতমুনি সংগ্রহ-কারিকা সমাযোগ দিয়ে একটি ছাকনি প্রস্তুত করে দিয়ে গিয়েছেন। এমনই বিচিত্র এই ছাকনির গঠন যে—ভবিষ্যতে কোনও কালে কেহ যদি সংগ্রহ-শাস্ত্রের মধ্যে, বা নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে পরতন্ত্রানুমোদিত সিদ্ধান্ত অনুপ্রবিষ্ট করেন, তখন এই সন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তকে ছাকনির উপর ঢেলে দিলে, সমস্তই ছাকনির উপরে আটকে থাকবে।

প্রকারান্তরে বলা যায়—সমগ্র নাট্যশাস্ত্রকেই (বর্তমান সংস্করণ) যদি ছাকনির উপরে ঢেলে দেওয়া যায়—তাহলে দেখা যাবে মূল ও প্রামাণিক উপদেশাবলী পরিশ্রুত হয়ে নীচে চলে গিয়েছে; প্রক্ষেপগুলি কিন্তু ছাকনিতে আটকে গিয়েছে! অবশ্য, এই ছাকনি যন্ত্রটি সদ্‌ব্যবহার করার উপযোগী জ্ঞান ও মনোভাব একান্তই প্রয়োজন।

সংগ্রহ-কারিকা যন্ত্রটি একটি বিশোধন-যন্ত্র এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এর

---

* বিশেষ ভাবে গান্ধর্ব-তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা পূর্বেই মৎকর্তৃক পরিকল্পিত ও পাণ্ডুলিপির আকারে রচিত আছে। সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার মধ্যে ঐ ব্যাখ্যা-রচনা অঙ্গীভূত করা অসম্ভব।

অন্য একটি রূপও আছে; উৎস্রবণ রূপ, উৎস্রবণ অর্থাৎ ফোয়ারা-যন্ত্র। লোকের মনোভূমির গভীরে অতিনিগূঢ় ভাবে অনুকরণমূলক প্রবৃত্তি সঞ্চারিত হ'তে থাকে। প্রকাশ্য ও সামাজিক শিক্ষা-সাধনা, জ্ঞানাভিজ্ঞান-প্রিয়তা ও কর্মতৎপরতা বহুল ভাবে উক্ত অনুকরণ-প্রবৃত্তি স্তর থেকে রস আকর্ষণ করে। এই রস স্বভাবে সুখ-দুঃখানুবিদ্ধ, সুতরাং নির্মল নয়। লোকে জানে এই রসধারা সর্বক্ষেত্রে নির্মল না হলেও দেহ ও মনের ক্ষুৎপিপাসানাশক ও সমাজ-হৃদয়ের উপকারক। অতঃপর, সেই লোকই উত্তম বুদ্ধি প্রয়োগ করে ঐ অবিশুদ্ধ অথচ উপকারী বস্তুকে অসংখ্য প্রকার চারুশিল্প-নির্মিতির কার্যে ব্যবহার করে এসেছে। এ রকম কার্যের চরম পরিণাম-অভিব্যক্ত ফল ফলেছে উত্তমোত্তম কলা-বিদ্যার মাধ্যমে। সহজ, সরল ও সত্যানুসন্ধানী অধ্যবসায়ের মধ্যে মন কখনও সুখ ও সৌন্দর্যের অনুভূতিকে ত্যাগ করতে পারেনি বলেই যাবতীয় কলা-বিদ্যা অর্থাৎ সৌন্দর্য-নির্মিতির বিদ্যা সম্ভব হয়েছে। নাট্য-গান্ধর্বের যাবতীয় প্রচেষ্টার মূলে এই উৎস্রবণ ব্যাপার রয়েছে। নাট্যশাস্ত্র সমগ্রত এ রকম উৎশ্রুত অভিজ্ঞতার চরম নিদর্শন। পরিশেষে—সংগ্রহ-কারিকা হ'ল সর্বোত্তম উৎস্রবণ ব্যবস্থা। সংগ্রহ-ভূমির অন্তর্দেশে অপূর্ব, স্নিগ্ধ অভিজ্ঞতার রস সঞ্চিত ও রক্ষিত। কারিকা-যন্ত্র দিয়ে সেই অভিজ্ঞতাকে বহুরূপে বহুধারায় উৎস্রাবিত করা হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতি, তথা বিশ্বজনসংস্কৃতির ইতিহাসে এই সংগ্রহ-কারিকারূপ উৎস্রাবন যন্ত্রের তুলনা নেই। এর সংক্ষিপ্ততার ও জ্ঞানঘন সুবিস্তৃতার তুলনা নেই ("নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ॥" ৬ অঃ ৯ শ্লোক)। উদ্দেশ্যপ্রয়োগ বিষয়ে এর ব্যাপকতার তুলনা নেই ("সূত্রতঃ সাতু বিজ্ঞেয়া কারিকাহর্থপ্রয়োগিনী॥" ৬ অঃ ১১ শ্লোক)। জীবনসূত্রের একপ্রান্তে রয়েছে নিগূঢ় লোক-স্বভাব; অন্য প্রান্তে রয়েছে বিমল আনন্দের সুপ্রতীত অনুভূতি। জগতের আত্মাতত্ত্ব-সমীক্ষকারী বহু বহু দার্শনিক ব্যক্তি এই শাশ্বত জীবনসূত্রকে মিথ্যা-মায়া ইতি প্রমাণ করে বাঙ্‌ময় ছেদনী দিয়ে একে কর্তিত ও স্বধর্মচ্যুত করার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু সে সমস্ত প্রয়াস প্রয়াস-রূপেই পর্যবসিত হয়েছে। সূত্রচ্ছেদ ঘটেনি। কারণ, বাঙ্‌ময় প্রচার-ছেদনী অত্যন্ত স্থূল; এই সূত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এমন কি, একে জীবনের সূক্ষ্মতম সূত্র মনে করা যায়। মোহমুদ্‌গর বা মোহকুঠার দিয়ে এই সূত্রকে বিধদ্ধত বা ছিন্ন করা অসম্ভব। গল্পের ডন্ কুইক্‌সোট্ নামে বীর পুরুষ বায়বীয় যন্ত্রকে দৈত্য মনে করে তার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তার খেয়াল্ ছিল না যে—ঐ যন্ত্রের সাহায্যে জলস্রোত নিয়ন্ত্রিত করে সেই অঞ্চলকে জীবন-রস দিয়েই স্নিগ্ধ ও আপ্যায়িত করা হয়। যাই হ'ক, গল্পের ডন্ কুইক্‌সোট্ কল্পনোচিত ধামে প্রস্থিত হন। এবং ঐতিহাসিক, প্রখ্যাত আত্মতত্ত্ববিদ্ জনেরা তাঁদের প্রচারোচিত ধামে প্রয়াণ করুন। নাট্য-শাস্ত্র, তথা সংগ্রহ-শাস্ত্র এবং উক্ত সংগ্রহ-কারিকা যন্ত্রটি কদাপি জীবন-শাথায় আরূঢ় হয়ে জীবনের মূল সূত্রকে ছিন্ন বা বিধদ্ধত করার চেষ্টা করেনি।

বাংলাভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তন

মনোজিৎ বসু

বাংলাভাষাতত্ত্বের আলোচনায় স্বরধ্বনির ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ, এই পরিবর্তনের ফলে শব্দের রূপটাই বদলে যায় স্থান থেকে স্থানান্তরে। অথচ, অর্থের কোনো হেরফের হয় না। যে-ধ্বনির সাহায্য না নিয়েই উচ্চারিত হয়, বা যে-ধ্বনির সাহায্য না নিয়ে অন্য ধ্বনি উচ্চারিত হতে পারে না, তাকেই বলা হয় স্বরধ্বনি। ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি অর্থাৎ ব্যঞ্জনধ্বনিকে উচ্চারিত হতে হলে তাই স্বরধ্বনির স্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। বাংলা ধ্বনির ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি যেন স্বভাব-কুলীন! আর কৌলীন্যে ব্যঞ্জনধ্বনি যেন ভণ্ড!

৯-কারকে বাদ দিলে বাংলায় স্বরবর্ণ আছে মোট এগারটি। কিন্তু স্বরধ্বনি আছে মাত্র সাতটি। হঠাৎ শুনলে, একটু যেন বেখাপ্পাই শোনায়। কিন্তু কথাটা ঠিক। স্বরবর্ণ এগারটি হ'লো—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও এবং ঔ। আর স্বরধ্বনি সাতটি—অ আ ই উ এ অ্যা এবং ও। ঈ আসলে ই-র দীর্ঘ রূপ, যেমন ঊ হ'লো উ-র। ঋ বর্ণ বটে, কিন্তু ধ্বনি নয়। ওটা আসলে র্+অ=র+ই=রি। আবার অ্যা আছে ধ্বনিতে,বর্ণে তার ঠাঁই নেই বর্ণমালায় উনি আত্মগোপন ক'রে রয়েছেন এ-র মধ্যেই। এ কখনও বিশুদ্ধ এ-ধ্বনিতে উচ্চারিত হয় (যেমন, একদা, দেখিল, খেলিতে প্রভৃতি শব্দের এ-ধ্বনি), কখনও আবার বিকৃত হয়ে হয় অ্যা (যেমন—এক=অ্যাক, দেখা=দ্যাখা, খেলা=খ্যালা)। আর, ঐ এবং ঔ সে দুটি তো এক এক জোড়া—স্বরধ্বনি, অর্থাৎ যৌগিক স্বর-ধ্বনি, ইংরাজিতে যাকে বলে Diphthong। ঐ=অই, আর ঔ=অউ।

বাংলায় স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয় কয়েকটি বিশেষ উচ্চারণ-রীতিতে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ক'রে কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় বিশেষ এক ধরনের স্বর-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন—অতি শব্দটি উচ্চারণে হয় ওতি। অর্থাৎ, অ-স্বরধ্বনির উচ্চারণ ও-স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। তেমনি—ইচ্ছা হ'লো ইচ্ছে (এখানে আ-ধ্বনি= এ-ধ্বনি); শুনা হ'লো শোনা (এখানে উ-ধ্বনি=ও-ধ্বনি); দেশী হ'লো দিশি (বা দিশী) (এখানে এ-ধ্বনি=ই-ধ্বনি)। এই জাতীয় ধ্বনি-পরিবর্তনের মূলে রয়েছে ভিন্ন প্রকৃতির স্বরধ্বনির মধ্যে একটা সঙ্গতি-স্থাপনের প্রয়াস। অর্থাৎ, উচ্চারণ-সৌকর্য-বিধান-ই হ'লো তার আসল কথা। এক স্বরধ্বনির সঙ্গে অন্য স্বরধ্বনির সঙ্গতি রক্ষা করা হয় ব'লে এই উচ্চারণ-রীতির নাম দেওয়া হয়েছে—**স্বরসঙ্গতি**। এ-জাতীয় স্বরপরিবর্তন বাংলা চলিতভাষায় একটা বৈশিষ্ট্য। ইংরেজি চলিত ভাষাতেও স্বরসঙ্গতির নিয়মে স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয়—— সেখানে তাকে বলা হয় Vowel Harmony।

স্বরসঙ্গতি দু'ভাবে হ'তে পারে। যেমন (১) পরবর্তী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি; আর, (২) পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি। পরবর্তী অক্ষরে (অর্থাৎ syllable-এ) ই, উ, য-ফলা, জ্ঞ কিংবা ক্ষ থাকলে সাধারণত পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি ও-ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—অতি=ওতি, অনিল=ওনিল, অতিশয়= ওতিশয়, অভিনয় = ওভিনয়, অধিকার—ওধিকার; বসু = বোসু ; মধু = মোধু, রঘু = রোঘু, অনুমান = ওনুমান, গরু = গোরু, মরুভূমি = মোরুভূমি; পদ্য = পোদ্য, কল্য = কোল্য, বধ্য = বোধ্য, তথ্য =তোথ্য, সত্য=সোত্য; বেদজ্ঞ= বেদোজ্ঞ, দৈবজ্ঞ = দৈবোজ্ঞ; অক্ষর = ওক্ষর, যক্ষ = যোক্ষ, রক্ষক= রোক্ষক, তক্ষক =তোক্ষক,

চক্ষু = চোক্ষু প্রভৃতি। যদি পরবর্তী অক্ষরে অ, আ, এ, বা ও থাকে তাহ'লে পূর্ববর্তী অক্ষরের ই-কারের উচ্চারণ সাধারণত এ-কারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন—নিব=নেব (অর্থাৎ, নিবো= নেবো), লিখ = লেখ, শিখ = শেখ, ঘির = ঘের; গিলা = গেলা, লিখা = লেখা, জিতা =জেতা, কিনা = কেনা, কিতাব =কেতাব; শিখে = শেখে, দিবে = দেবে, ভিজে = ভেজে, মিশে = মেশে প্রভৃতি। তারপর, পরবর্তী অক্ষরে যদি অ, আ, এ কিংবা ও থাকে তাহ'লে এই একই কারণে, পূর্ববর্তী অক্ষরের উ-ধ্বনি ও-ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—গুন = গোন, মুড় = মোড়, ভুল = ভোল; শুনা = শোনা, বুনা = বোনা, বুজা = বোজা, খুলাও = খোলাও, ভুলাই = ভোলাই; শুনে = শোনে, ছুড়ে = ছোড়ে, তুলে = তোলে প্রভৃতি। এই স্বরসঙ্গতির জন্যই আবার অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অক্ষরের এ-ধ্বনি অ্যা-ধ্বনিতে পরিণত হয় যদি দেখা যায় পরবর্তী অক্ষরে অ, আ, এ কিংবা ও আছে। যেমন—এক = অ্যাক, দেখ = দ্যাখ, গেল = = গ্যাল, এত = অ্যাত, এখন = অ্যাখন, এমন = অ্যামন; খেলা = খ্যালা, বেলা = ব্যালা ('বেলা' যেখানে নাম, সেখানে অবশ্য নয়), মেলা = ম্যালা, ফেলা = ফ্যালা, ঠেকা = ঠ্যাকা, বেটা = ব্যাটা, বেচা = ব্যাচা (কিন্তু, 'কেনা' 'ক্যানা' নয়), খেসারত = খ্যাসারত; দেখে = দ্যাখে, বেচে = ব্যাচে, গেছে = গ্যাছে, খেলে (খেলা করে) = খ্যালে; এলোপ্যাথি=অ্যালোপ্যাথি, খেলো-য়াড় = খ্যালোয়াড় প্রভৃতি। এই নিয়মেই পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণে যে-সব শব্দের এ-ধ্বনি অবিকৃত থাকে, সেই সব শব্দই আবার পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে অ্যা-ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— দেশ হয় দ্যাশ, তেল হয় ত্যাল, বেত হয় ব্যাত, কেদার হয় ক্যাদার, নেপাল হয় ন্যাপাল, তেজ হয় ত্যাজ্, দেবতা হ'য়ে যান দ্যাবতা! পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে যেখানে পূর্ববর্তী অক্ষরের ও-ধ্বনি উ-ধ্বনিতে পরিণত হয় সেখানেও স্বরসঙ্গতির প্রভাব। যেমন—ঝোল হয় ঝুল, কোটি হয় কুটি, বোতাম হয় বুতাম, শোচনীয় কাণ্ড হয় শুচনীয় কাণ্ড! পরবর্তী অক্ষরে যদি ই (বা ঈ) থাকে তাহ'লে পূর্ববর্তী অক্ষরের এ-ধ্বনি পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণে ই (বা ঈ) ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— দেশী = দিশি (বা দিশী) জেদী = জিদী, তেলি = তিলি প্রভৃতি।

এবারে বলা যাক পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতির কথা। পূর্ববর্তী অক্ষরের ই-ধ্বনি যেমন পরবর্তী অক্ষরের আ-ধ্বনিতে প্রভাবে এ-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এরকম স্বরসঙ্গতি পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক বা চলিতভাষার একটা বৈশিষ্ট্য। যেমন— ইচ্ছা—ইচ্ছে, মিতা—মিতে, ফিতা—ফিতে, বিলাত—বিলেত, খিলান—খিলেন, নীলাম—নীলেম, চিতাবাঘ—চিতেবাঘ, পিঠা—পিঠে, পিসামশাই—পিসেমশাই, নিকাশ—নিকেশ, বিদায়—বিদেয়, মিথ্যাবাদী—মিথ্যেবাদী প্রভৃতি। পূর্ববর্তী অক্ষরে যদি উ (বা ঊ) ধ্বনি থাকে এবং পরবর্তী অক্ষরে থাকে আ-ধ্বনি, তাহ'লে স্বরসঙ্গতির প্রভাবে সেই আ হয়ে যায় ও। যেমন—রূপা—রুপো, খুড়া—খুড়ো, বুড়া—বুড়ো, চুলা—চুলো, জুতা—জুতো, পূজা—পুজো, ধুলা—ধুলো, কুঁজা—কুঁজো, জুড়ান—জুড়ানো, লুকান—লুকোন, কুমড়া (কুম্+ড়া)=কুমড়ো, ধুমসা (ধুম্+সা)= ধুমসো, ঠুনকা (ঠুন্+কা ঠুনকো, ফুলকা (ফুল্+কা)=ফুলকো প্রভৃতি। দুই অক্ষরের শব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষরে যদি অ-ধ্বনি (কিংবা প্রথম-অক্ষরে লুপ্ত অ-ধ্বনি) থাকে, তাহলে চলতিভাষায় সাধারণত দ্বিতীয়-অক্ষরের অ-ধ্বনি পূর্ণ বা ঈষৎ ও-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন— রতন (র+তন্)=রতোন, যমজ (য+মজ)=যমোজ, অম্বল (অম্+বল)=অম্বোল, ধমক (ধ+মক্) =ধমোক, দম্পতি (দম্+পতি) = দম্পোতি, পণ্ড (পণ্+ড) = পণ্ডো, গণ্ড (গণ্+ড)= গণ্ডো, পঞ্চ (পন্+চ) =পন্চো প্রভৃতি।

আর এক নিয়মে বাংলাভাষায় স্বর-পরিবর্তন হয়। তার নাম **অপিনিহিতি**, ইংরেজিতে

যাকে বলা হয় Epenthesis। আসলে এটা একরকমের স্বরবিকৃতি। শব্দের মধ্যকার বা শেষের ই-ধ্বনি কিংবা উ-ধ্বনি যদি তাদের উচ্চারণের সময় আসবার আগেই উচ্চারিত হয়ে যায়, তাহলে সেই ধ্বনি-পরিবর্তনের রীতিকে অপিনিহিতি নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—আজি=আইজ। আজি শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ হ'লো আ+জ্+ই, কিন্তু অপিনিহিত উচ্চারণ আ+ই+জ্। অর্থাৎ যে-সময় ই-ধ্বনির উচ্চারণ হবার কথা, তার আগেই সে উচ্চারিত হ'লো। সেইরকম—কালি=কাইল, চারি—চাইর, করিয়া=(কইর্য়া) = কইর‍্যা, দেখিয়া = দেখ্যা, সাধ্—সাউধ প্রভৃতি। অপিনিহিতি-তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার পূর্বাভাস হেতু আগমও দেখা যায়। যেমন—জল্য়া হয় জউল্য়া। এখানে 'জ্'-র উ-ধ্বনি ঠিকই রইলো, কিন্তু পূর্বাভাসহেতু 'ল'-এর আগে আর একটি উ-ধ্বনির আগম হ'লো। এই ধরণের স্বরবিকৃতি বা উচ্চারণরীতি মধ্যযুগের বাংলা-ভাষার একটা বিশেষত্ব বলে স্বীকৃত হতো। পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাস, বিজয় গুপ্ত এবং আরও অনেকের রচনায় অপিনিহিত শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করবার বিষয়। যেমন—আসিহ (আস্ইহ)=আইস (শেষ 'হ' কারের লোপ), কহিল (কহ্ইল)=কইহল (হ্-এর লোপ) বসিহ (বস্ইহ)=বইস। বর্তমানে এই অপিহিনিতি কেবল যেন পূর্ববঙ্গীয় তথা উত্তর বঙ্গের অংশ-বিশেষের মৌখিক-ভাষার বিশেষত্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কথাভাষায় অপিনিহিত শব্দের প্রচলন বড় একটা দেখা যায় না। তবে, কোনো কোনো অঞ্চলে কচিৎ-কদাচিৎ দু'একটা শব্দ মেলে। যেমন— কাঁহিচ (কাঁচ), গাইতি (গাঁতি) প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, অপি-নিহিত শব্দ সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয় না, তার ঠাঁই কেবল চলিত বা কথাভাষায়। অপিনিহিতির নিয়মে উদ্ভূত কয়েকটি শব্দের উদাহরণ এখানে উল্লেখ করি। যেমন, (ই-কারের অপিনিহিতি); সইরষা—সরিষা, নাইরকেল—নারিকেল, আইলপনা—আলিপনা, সইত্ত—সত্ইয় (সত্য), কাইব্—কাব্ইয় (কাব্য), মইদ্ধ—মধ্ইয় (মধ্য), জইম্ম—জন্ইয় (জন্য), পইখ—পথ্ইয় (পথ্য), বাইচ্যা—বাচ্ইয়া (বাচিয়া), বইসা—বস্ইয়া (বসিয়া) ভুইল্যা—ভুলইয়া (ভুলিয়া), ডাকাইতি—ডাকাত্ই (ডাকাতি), বিলাইতী—বিলাত্ই (বিলাতী) প্রভৃতি; (উ-কারের অপিনিহিতিঃ সাউধ্—সাধ্, দাউদ—দাদ্ ('দন্দ্' শব্দজাত), জউল্য়া—জল্য়া, মাউঝ্য়া—মাঝ্য়া প্রভৃতি।

অপিনিহিতি যেমন পূর্ববঙ্গীয় কথাভাষার একটা বিশেষ উচ্চারণরীতি, **অভিশ্রুতি** তেমনি পশ্চিমবঙ্গের। এই উচ্চারণরীতিতে যেভাবে স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, তারও মূলে রয়েছে অপিনিহিতির প্রভাব ও প্রসার। অপিনিহিতির ফলে শব্দের মধ্যকার বা শেষের যে ই বা উ-ধ্বনি আগে চলে যায়, তা আগের অক্ষরের অ বা আ কিংবা অন্য কোনো স্বরের পাশে বসে একটা যৌগিক-অক্ষর বা Diphthong-এর সৃষ্টি করে। অ-কারের পর এই ধরনের অপিনিহিত ই দেখা দিলে সাধারণত তার লোপ হয়, কিন্তু তার ফলে সেই অ-কার ও-কারে পরিবর্তিত হয়ে যায় (কিংবা, বলা যেতে পারে, সেই অ আর ই অর্থাৎ যৌগিক অই ও-ধ্বনিতে পরিণত হয়)। যেমন—'করিয়া' শব্দটি অপিনিহিতির প্রভাবে হ'লো কইর‍্যা (ক+অ+ই+র‍্যা) আর তার অভি-শ্রুতি রূপ দাঁড়ালো কোরে (বা ক'রে)। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় শব্দের শেষ য়া=ইআ (বা য-ফলা) এ-তে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, বিপরীত সন্ধি (ই+আ'র বদলে আ+ই'র সন্ধি, অর্থাৎ আ+ই=এ)। সেইরকম—চলিল থেকে অপিনিহিত চাইল্‌স, অভিশ্রুত চোল্‌ল্ (যা চল্‌ল), করিল থেকে কইর্‌ল, তা থেকে কোর্‌ল (বা ক'রল)। এই নিয়মেই ব'লে, চ'লে, ধ'রে, প'ড়ে, পোটো (পট্য়া—পউট্য়া) প্রভৃতি অভিশ্রুত শব্দ পাওয়া যায়। আ-কারের পর অপিনিহিত ই দেখা দিলে সাধারণত তার লোপ হয়, কিন্তু সেই আ-কার অভিশ্রুতির ফলে এ-

ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন—রাখিয়া শব্দটি অপনিহিতির প্রভাবে হ'লো রাইখ্যা, আর তার অভিশ্রুত রূপ দাঁড়ালো—রেখে। অর্থাৎ র্+আ+ই+খ্যা' থেকে র+এ+০+খ (খ্+ইঅ=খ্+এ)। সেইরকম—আসিয়া থেকে হয় এসে, হাসিয়া থেকে হয় হেসে, ভালোবাসিয়া থেকে হয় ভালোবেসে। আবার, এই একই নিয়মে মেছো শব্দটি আমরা পাই মাছুয়া থেকে। অর্থাৎ, মাছুয়া থেকে অপিনিহিত মাউছুয়া, তারপর অভিশ্রুত মেছো (মাউ=ম্+আ+উ=ম+এ=মে এবং ছুয়া =ছ্+উ+আ= ছ্+আ + উ=ছো)। এই অভিশ্রুতির নিয়মেই পাওয়া যায় বলিয়ে, নাচিয়ে, করেছি, শহরে, কুঁদুলে প্রভৃতি শব্দ। অর্থাৎ বলাইয়া (ব+ল+আ+ই+য়া) থেকে বলিয়ে (ব+ল্+০+ই+এ), নাচাইয়া (না+চ্+আ+ই+য়া) থেকে নাচিয়ে (না+চ+০+ই+এ), করিয়াছি (ক+র+ই+য়া+ছি) থেকে করেছি (ক+র্+এ (উল্টো য়া=আ+ই)+ছি), শহরিয়া (শ+হ্+র+ই+য়া) থেকে শহুরে (শ+হ্+উ+এ), কোন্দলিয়া (ক্+ও+ন্+দ্+ল+ই+য়া) থেকে কুঁদুলে (ক+উ+' (ন্-এর বদলে) +দ্+উ+ল্+এ)। ইংরেজিতে এই জাতীয় স্বর-ধ্বনির পরিবর্তনকে বলা হয় Umlaut। যেমন—mouce থেকে mice (অর্থাৎ ou এই Diphthong শব্দ i এই স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে), man থেকে men (a=e অর্থাৎ, অ্যা হয়েছে এ), French থেকে (a=e এবং শেষ e-ধ্বনি h-তে রূপান্তরিত) প্রভৃতি।

আর এক শ্রেণীর স্বরপরিবর্তন আছে যার নাম **অপশ্রুতি**। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Ablaut বা Vowel Alterance। এতে ক'রে ধাতুর মূলে যে স্বরধ্বনি থাকে তারই পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত এর উৎস বাংলাভাষায় খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে, বাংলাভাষার নিজস্ব কয়েকটি ধাতুর প্রয়োগে অপশ্রুত উচ্চারণরীতি লক্ষ্য করা যায়। পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সংস্কৃত ধাতু থেকে শব্দ তৈরি ক'রবার সময় মূল স্বরধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটে তাই হ'লো—অপশ্রুতি। যেমন—সংস্কৃত 'চল্' ধাতু থেকে গঠিত শব্দ হ'লো 'চলে', আর তা থেকেই এলো অপশ্রুত 'চালে' (অবশ্য গিজন্তে)। তেমনি—পড়্-ধাতু থেকে পড়ে, তা থেকে 'পাড়ে' (গিজন্তে) প্রভৃতি।

উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য ,যুক্ত-ব্যঞ্জন বর্ণকে আলাদা ক'রে তার মধ্যে স্বরধ্বনির প্রয়োগ ক'রে যে উচ্চারণ করবার রীতি আছে, ব্যাকরণের ভাষায় তার নাম—**স্বরভক্তি** (অর্থাৎ, স্বর-দ্বারা যা বিভক্ত) বা **বিপ্রকর্ষ**। যেমন—রতন (রত্ন থেকে)। অর্থাৎ, র+ত্+ন্ = র+ত্+অ+ন। সেইরকম জনম (জন্ম), ভকত (ভক্ত), ধরম (ধর্ম), গরব (গর্ব), তিরপিত (তৃপ্ত) পিরীত (প্রীতি), সিনান (স্নান) প্রভৃতি।

প্রাকৃতেও এই স্বরভক্তি ছিল। যেমন— সিনেহ (স্নেহ থেকে), রদন, রঅণ (রত্ন থেকে)। প্রাচীন বাংলায়, বিশেষ ক'রে বৈষ্ণবযুগের বাংলাভাষায় (কাব্যসাহিত্যে) এই শ্রেণীর স্বরধ্বনির পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। যেমন—

'বাঁশীর **শবদে**' (শব্দে) চিত্ত **বেআকুল** (ব্যাকুল) বড়ায়ি'। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
'তোহ্মাকে **জুগুত** (যুক্ত) নহে এ সব **করম** (কর্ম)'।। (ঐ)
'পাপ **বেআপিত** (ব্যাপ্ত, ব্যাপ্ত) সে **ধরম** (ধর্ম) করে খএা' (ঐ)
'**পুরুবে** (পূর্বে) যে কাজ হৈল সে ভৈল **গুপতে** (গুপ্তে অর্থাৎ গোপনে)।' (ঐ)
'কোন বিধি **সিরজিল** (সৃজিল) সোতের শেওলি।'—চণ্ডীদাস
'সদাই **ধেয়ানে** (ধ্যানে) চাহে মেঘপানে।'—(ঐ)
'নাম **পরতাপে** (প্রতাপে) যার এছন করাল গো
অঙ্গের **পরশে** (স্পর্শে) কিবা হয়।'—(ঐ)

'**করম** (কর্ম) বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া **পরসঙ্গ** (প্রসঙ্গ) ।'—বিদ্যাপতি
'গৃহপতি **তরজনে** (তর্জনে) গুরুজন **গরজনে** (গর্জনে)
অন্তরে উপজয়ে হাস ॥' — গোবিন্দদাস
'পুলক ঢাকিতে করি কত **পরকার** (প্রকার) ।'— জ্ঞানদাস
'ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া **তরাস** (ত্রাস) ।' — কৃত্তিবাস
'**বরিষণ** (বর্ষণ) করে আর বলে মার মার।' — (ঐ)

এই রীতিতে উচ্চারণ করলে শব্দের কোমলতা যে বাড়ে তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, এই জাতীয় স্বরভক্তি-জাত শব্দ ছন্দের মাধুর্যও বাড়ায়। এই কারণেই, প্রাচীন বাংলায়, এমন কি এ-যুগের বাংলায়, বিশেষ ক'রে কবিতায়, স্বরভক্তি-জাত শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করবার মতো। চলিত ভাষাতেও এ-জাতীয় শব্দ অনেক। যেমন— **গেরাম** (গ্রাম) **পুত্তুর** (পুত্র), **শত্তুর** (শত্রু), **দরদ** (দর্দ), **মিত্তির** (মিত্র), **চিত্তির** (চিত্র), **শুক্কুরবার** (শুক্রবার), **মরদ** (মর্দ) প্রভৃতি।

অ-আগমে স্বরভক্তি : জনম (জন্ম), যতন (যত্ন), স্বরগ (স্বর্গ), ধরম (ধর্ম), পরব (পর্ব), স্বপন (স্বপ্ন), দরশন (দর্শন), হরষ (হর্ষ), বরষা (বর্ষা), ভকতি (ভক্তি), শকতি (শক্তি), উতপল (উৎপল), তরজন (তর্জন) প্রভৃতি। [এ-যুগের কবিতায় প্রয়োগ; 'তোমার **পরশরতন** (স্পর্শ+রত্ন) গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে।'—রবীন্দ্রনাথ। 'দুঃখের **বরষায়** (বর্ষায়) চক্ষের জল যেই নামল।'—রবীন্দ্রনাথ।] **ই-আগমে** স্বরভক্তি : হরিষ (হর্ষ), পিরিতি (প্রীতি), সিনান (স্নান), কিরপা (কৃপা), বরিষণ (বর্ষণ), তিরিশ (ত্রিশ) প্রভৃতি। [এ-যুগের সাহিত্যে প্রয়োগ : 'সাগর-জলে **সিনান** করি বসিয়া উপকূলে।'—রবীন্দ্রনাথ। 'মা-গঙ্গার খুব **কিরপা** বলতে হবে মা-ঠাকরুণ, নিতে নিতে ফিরিয়ে দিয়েছেন।' —প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'হাসি-ক্রন্দন—তব উৎসব! **পিরীতির** পারাবার।' —মোহিতলাল।] এর পরে যেমন— **উ-আগমে** স্বরভক্তি : মুকুতা (মুক্তা), মুগুধ (মুগ্ধ), ভুরু (ভ্রূ প্রভৃতি। [এ-যুগের সাহিত্যে প্রয়োগ : '**মুকুতার** পাঁতি যায় গড়াগড়ি।' —করুণানিধান।] **এ-আগমে** স্বরভক্তি : গেরাম (গ্রাম), ভূতপেরেত (ভূতপ্রেত), গেরাস (গ্রাস), গেলাস (গ্লাস), কেলাস (ক্লাস), শেলেষ্মা (শ্লেষ্মা), মেলেচ্ছ (ম্লেচ্ছ), ছেরাদ্দ — শ্রাদ্ধ) প্রভৃতি। [এ-যুগের সাহিত্যে প্রয়োগ : 'সারা **গেরামে** জনমনিষ্যি নেই।'— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শুরু হয়ে গেল ভূতের বাপের **ছেরাদ্দ**!'— উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।] **ও-আগেম** স্বরভক্তি : শোলোক (শ্লোক), মোরগ (মুর্গ) প্রভৃতি। (স্মরণীয়— 'মাগো আমার **শোলোক**-বলা কাজলাদিদি কই?'—যতীন্দ্রমোহন বাগচী)। ইংরেজিতেও এই শ্রেণীর উচ্চারণরীতি আছে। তাকে বলা হয় Anaptyxis। বাংলা কথ্য ভাষায় অনেক বিদেশী শব্দও স্বরভক্তি-র প্রভাবে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে দেখা দেয়। যেমন— ফরাসী fikr (ফিক্র) বাংলাতে 'ফিকির'; ইংরেজি film বাংলাতে 'ফিলিম', আবার class হয় "কেলাস", যেমন glass হয় 'গেলাস', plate হয় 'পেলেট' flute হয় "ফুলুট" (ফুলুট বাঁশি), brush হয় 'বুরুশ', blue হয় 'বুলু'! এই স্বরভক্তি-তেই ফারসী "সির্ফ"-শব্দটি বাংলায় একেবারে 'সেরেফ্' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

অনেক সময় তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করবার ফলে, শব্দের কোনো স্বরধ্বনি যদি লোপ পায়, তাহ'লে সেই উচ্চারণ রীতিকে বলা হয় **স্বরলোপ**। যেমন —বসতি (ব্+অ+স্+অ+তি)=বস্‌তি বা বস্তি (ব্+অ+স্+০+তি); জানালা=জান্‌লা (আ এখানে লুপ্ত), দরজা=দর্‌জা (এখানে

র্+অ'এর অ লোপ পেয়েছে) প্রভৃতি। প্রথম স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলা হয় আদ্য-স্বরলোপ (Apthesis)। যেমন— অলাবু — লাবু — লাউ। মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি লুপ্ত হ'লে তাকে বলা হয় মধ্য-স্বরলোপ (Syncope)। যেমন—দরজা—দর্‌জা, নাতিনী—নাত্‌নী, ভগিনী—ভগ্নী, মরিচা—মর্‌চে, পলিতা—পল্‌তে, চালিতা—চাল্‌তে প্রভৃতি। শব্দের শেষ স্বরধ্বনি লোপ পেল তাকে বলা হয় অন্ত্যস্বরলোপ। যেমন—আজ=আজ্, কাল=কাল্, হাত=হাত্, ভাত =ভাত্ ইত্যাদি। (বাংলাভাষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'লো যে, তার বেশির ভাগ অ-স্বরান্ত শব্দই উচ্চারণের ক্ষেত্রে হসন্তভাবে উচ্চারিত। কিন্তু, উড়িষ্যায় হসন্তের কারবার বড় কম। তাই সেখানে ভাত্ নেই, আছে ভাত (অর্থাৎ, ভা+ত+অ), পথ্ নেই—আছে পথ (অর্থাৎ, প+থ+অ)!

বাংলা চলিতভাষায় আরও বহুরকমের শব্দ আছে যেগুলি ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন নিয়মে গঠিত। যেমন ধরা যাক, ধম্ম, কম্ম, গিন্নী, গপ্প, বজ্জাত, ধন্না, ঘরকন্না, চন্নন, বট্‌ঠাকুর জাতীয় শব্দগুলি। এ-গুলি যে উচ্চারণরীতিতে গঠিত হয়েছে তাকে বলা হয় **সমীভবন**। ইংরেজি ধ্বনিবিজ্ঞানে যাকে বলা হয় Assimilation। অর্থাৎ, শব্দের মধ্যকার ব্যঞ্জনধ্বনিকে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত করার নামই সমীভবন। এই নিয়মেই ধর্ম (ধর্‌ম) হয়েছে ধম্ম, গল্প (গল্‌প) হয়েছে, গপ্‌প, গৃহিণী হয়েছে গিন্নী (অর্থাৎ, গৃ-র ঋ-কার লুপ্ত হয়েছে এবং তার জায়গায় এসেছে ই-কার, আর 'হ' 'ন'-তে রূপান্তরিত হয়ে শেষ ন-তে যুক্ত হয়েছে), বদজাত হয়েছে বজ্জাত (অর্থাৎ, দ=জ), ধর্‌না হয়েছে ধন্না (অর্থাৎ, র=ন্) ঘরকর্‌না থেকে এসেছে ঘরকন্না (অর্থাৎ, করনা-র র্ 'ন'-তে পরিবর্তিত), আর চন্দন থেকেই এসেছে চন্নন (এখানে চন্‌দন-এর দ=ন)। বড়ঠাকুর-ও এই একই পথ ধ'রে বঠ্‌ঠাকুর (বা বট্‌ঠাকুর, যেহেতু ট ও ঠ সমগোত্রীয়)-এর রূপ নিয়েছেন।

এই সমীভবন ঘটতে পারে তিনভাবে। যেমন (১) পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পূর্বধ্বনিতে রূপান্তর : ভস্ম থেকে ভস্‌স, চন্দন থেকে চন্নন, ধন্য থেকে ধন্ন, জন্য থেকে জন্ন। এই জাতীয় সমীভবনকে বলা যায় প্রগত-সমীভবন (Progressive Assimilation), (২) পরবর্তী-ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী-ধ্বনির পরধ্বনিতে রূপান্তর : ধর্ম থেকে ধম্ম, গল্প থেকে গপ্‌প, কর্তা থেকে কত্তা, গৃহিণী থেকে গিন্নী! এই শ্রেণীর সমীভবনের নাম দেওয়া হয়েছে পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation)। (৩) দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির পরস্পরের প্রভাবে সম্পূর্ণ অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিবর্তন : উৎশ্বাস থেকে উচ্ছ্বাস। শেষোক্ত এই সমীভবনের নামকরণ করা হয়েছে অন্যোন্য-সমীভবন (Mutual Assimilation)।।

এই সমীভবন-এর বিপরীত ব্যাপারও আছে। তাকে বলা হয় **বিসমীভবন**। ইংরেজিতে যার নাম Dissimilation। এই উচ্চারণ রীতিতে শব্দের মধ্যকার দুটি সমান ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন—লাল হয় নাল, লাঙল হয় নাঙল, তরবার হয় তলোবার (বা তলোয়ার), অম্ল হয় অম্বল! পোর্তুগীজ 'আর্মারিও' শব্দটি বাংলায় 'আলমারি' (শেষ 'ও' লুপ্ত) হয়েছে এই নিয়মেই।

উচ্চারণের শৈথিল্যে, অনেক সময় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জন বর্ণের অবস্থানের যে-পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় **বর্ণ-বিপর্যয়** (Metathesis)। (ব্যঞ্জনধ্বনি-বিপর্যয় বল্‌লেও ক্ষতি হয় না। কারণ, উচ্চারণে যে বিপর্যয় ঘটে সেটা ব্যঞ্জনধ্বনিরই বিপর্যয়।) যেমন— —বারানসী হয় বার্নারসী, বাতাসা হয় বাসাতা, পিশাচ হয় পিচাশ, বাক্স হয় বাস্‌ক, রিকসা হয় রিস্‌কা। এর প্রভাবে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখেও ইংরেজি risk (রিস্ক) হয়ে দাঁড়ায় riks (রিক্‌স্)!! আর এক রকমের ধ্বনি-পরিবর্তন আছে, যাকে বলা হয় **স্বরাগম** (Prothesis)।

উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের প্রথমে অবস্থিত যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে যখন কোনো স্বর-ধ্বনির আগম হয়, তখন সেই উচ্চারণরীতিকে এই নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—ছিল স্পর্ধা, হ'লো আস্পর্ধা, ছিল স্টেশন, তা থেকে স্টিশন, শেষটায় একেবারে ইস্টিশন! এই নিয়মেই স্ত্রী হয়েছেন ইস্তিরি, স্কুল হয়েছে ইস্কুল। (প্রাকৃতেও এমনটা ঘটতো। যেমন—(সং) স্ত্রী—(প্রা) ইত্থী!)। ক্ষেত্রবিশেষে, শব্দের কোনো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনিকে জোর দেবার জন্য দুবার উচ্চারণ করা হয়। যেমন—ছোট=ছোট্ট, বড়=বড্ড, সবাই=সব্বাই, জবর=জব্বর, সকাল=সক্কাল, পাকা=পাক্কা, বাবা = বাব্বা, একেবারে = এক্কেবারে, একরতি = একরত্তি। প্রভৃতি। এই উচ্চারণরীতির নাম দেওয়া হয়েছে **বর্ণ-দ্বিত্ব**। ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক থেকে একে ব্যঞ্জনধ্বনি-দ্বিত্ব নামে অভিহিত করলেই যুক্তিসঙ্গত হয়। যেখানে পর পর একই বর্ণ কিংবা একজাতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশ ঘটে, সেখানেও উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাদের একটিকে লোপ ক'রে দেবার রীতি আছে। সেই রীতিকেই বলা হয় **সমবর্ণ-চ্যুতি** বা **সমাক্ষর-লোপ** (Haplology)। যেমন— বৌদিদি থেকে বৌদি, বড়দিদি থেকে বড়দি, মেজদাদা থেকে মেজদা, মুখকোষ থেকে মুখোষ (বা মুখোশ), মুখখানি থেকে মু'খানি। উচ্চারণের সুবিধার জন্য, (একজাতীয় ধ্বনি না হলেও) শব্দের মধ্যকার কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি (বা স্বরধ্বনি-যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি) লোপ পেতে পারে। যেমন—ফাল্গুন=ফাগুন (ল এখানে লুপ্ত), তালাহিদা=আলাদা, ফলাহার=ফলার প্রভৃতি। এই উচ্চারণরীতির নাম দেওয়া যেতে পারে **বিসম-বর্ণচ্যুতি**।

পশ্চিমবঙ্গীয় কণ্ঠস্বরে অনেক সময় মহাপ্রাণ-বর্ণ অল্পপ্রাণ-বর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানে সেই শ্রেণীর উচ্চারণ-রীতির নাম দেওয়া হয়েছে—**ক্ষীণায়ন** (Dc-aspiration)। যেমন—কথা হয়ে যায় কতা, যেমন কথাবার্তা হয় কতাবার্তা (অনেক ক্ষেত্রে আবার কতাবাত্রা!)। মায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ না ক'রেও অনেকে তাঁদের নিজেকার মাথায় হাত ঠেকিয়েই বলেন 'আমার মাতা'! এইজন্য বোধ করি, পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের কোনো মাথাব্যথা নেই, আছে কেবল মাতাব্যাতা! আবার উল্টোটাও আছে। পূর্ববঙ্গীয় কণ্ঠস্বরে অনেক ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ-বর্ণও মহাপ্রাণ-বর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। তাই, আগেকার উচ্চারণ-রীতি ক্ষীণায়ন ব'লে, এই রীতির নামকরণ করা হয়েছে **পীনায়ন** (Aspiration)। যেমন—কাঁটাল = কাঁঠাল, হাত = হাথ, ভাড়াটে =বারাটে (বারাইট্টা!), শাক=শাগ প্রভৃতি। ক্ষীণায়ন পূর্ববঙ্গীয় কন্ঠস্বরেও শোনা যায়। যেমন—বাড়ি = বারি, ভাড়া = ভারা, মড়া=মরা!

বলাবাহুল্য, শব্দের এই শ্রুতিধ্বনি লেখায় স্থান পায় না। কিন্তু, ধ্বনির এই শ্রুতি-বৈচিত্র্য যদি কোনো কারণে কারও মধ্যে পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধে, তাহ'লে বানানে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটবার আশঙ্কা থেকে যায়। কলিকাতার পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত নাউ, নেবু, নঙ্কা, নেপ, নুচি জাতীয় কথ্যভাষার শব্দগুলি যদি সেই অসাবধানী পথ ধরে একবার লেখ্যভাষায় ঠাঁই পেয়ে যায় তাহ'লে আর লাউ, লেবু, লঙ্কা, লেপ্ এ-সবের সন্ধান পাওয়া যাবে কি? 'নুচি'-র মুখদর্শন ক'রে 'লুচি'-ও পালাবে বে-লুচিস্তানে! ধ্বনি পরিবর্তনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বাংলাদেশের সব জেলাতেই আছে। যেমন— 'আমবাগানে রামবাবু ঢুকেছেন।' —একথা বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের লোকেদের মুখে শোনাবে —'রামবাগানে আমবাবু ঢুকেছেন'। তাই ব'লে, লেখার মধ্য দিয়ে সে-কথা বলা চলে না কোনমতেই।

গীতিকবিতা ও গান

আশা দাস

দৈনন্দিন জীবনে মানুষের বহু দায়িত্বের বোঝা, বহু কর্তব্যের আহ্বান। ললিতকলা দেয় মানুষকে সেই দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্তি। শিল্পকলায়, কাব্যে, গানে মানব মনের সুকুমার সৃজনী প্রতিভা ধরা পড়ে। এ ধরা দেওয়াতেই তার আনন্দ, এ আত্মপ্রকাশেই তার চরম সার্থকতা। ললিতকলার ইতিহাসে গীতিকবিতা ও গানের স্থান অনন্য ও অনবদ্য। সাহিত্যের আদিমতম-যুগে কাব্যই ছিল রচনার মাধ্যম। শুধু বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতিষ, স্থাপত্যই নয়, চিকিৎসাশাস্ত্র এমন কি অঙ্ক শাস্ত্র পর্যন্ত সেদিন পাঠকসমাজের কাছে হাজির হতো কাব্যের স্কন্ধে বাহিত হয়ে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড ওডেসি মহাকাব্য হয়েও একাধারে ইতিহাস, জীবন চরিত সমাজবিজ্ঞান ও দর্শন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রসমূহেরও নাম ছিল কাব্যপ্রদীপ, কাব্য চন্দ্রমা ইত্যাদি। দীর্ঘদিন এ ধারার অনুসরণ করে সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যও পূর্বসূরি সংস্কৃত সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসুরণ করেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম কবিতায় ও গানে। বাংলা সাহিত্যের জন্মক্ষণের সেই অগঠিত, অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ অঙ্কুরটি আজ বহুজনের সেবায় ও পরিচর্যায় পত্রপুষ্পপল্লব সুশোভিত হয়ে বড় হয়ে উঠছে। সেদিনকার সেই চর্যাপদরূপী অঙ্কুরটিই আজকের দিনের সাহিত্যবনস্তালীর প্রধান মহীরূহ। এ মহীরুহের বহু শাখাপ্রশাখার প্রধান কান্ড কাব্য। এ কাব্যই নানাপ্রশাখায় পরিব্যাপ্ত হয়ে বহু পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে বাংলাসাহিত্য তপোবনের সিন্ধপুণ্যোজ্জ্বল পরিবেশন সৃষ্টি করেছে। গীতিকাব্য ও গান এ কাব্যশাখারই এক একটি মনোরম প্রশাখা।

'গীতি কবিতা'—নামাকরণ থেকেই বোঝা যায় এ কাব্য রচিত হয়েছিল সুরলয় সহকারে গানের বা আবৃত্তির জন্য। তাই, গানের সঙ্গে গীতিকবিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মানব ইতিহাসের আদি যুগের কথা ভাবতে গেলে একটি দৃশ্য চোখের উপর ভেসে ওঠে। মানুষ দৈনিক জীবন সংগ্রামের শেষে সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট আসরে জমায়েত হচ্ছে। এ আসরে আত্মীয়স্বজনরা সবাই এসে মিশেছে অবসরবিনোদনের জন্য। আসরে নাচের পরে গান, আবার গানের পরে নাচ চলেছে। প্রাকৃতিক কোন শক্তির উদ্দেশ্যেই এ গান রচনা—যে শক্তির প্রকাশ সেদিনের মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছিল আনন্দ, বিস্ময়, ভয় ও শ্রদ্ধাবোধ। সূর্যের প্রকাশে অন্ধকার কেটে যায়। রাত্রের অন্ধকারে সন্ত্রস্ত মানুষ দিনের আলোতে স্বস্তিবোধ করে, খুঁজে নেয় উদরস্ফূর্তির সম্বল। মানুষের তাই বুঝতে বেশী দিন সময় লাগে না সূর্যের মতন এমন বন্ধু আর কে? আদিম মানুষের শ্রদ্ধাপ্রণোদিত হৃদয়ের প্রথম বাঙ্ময় প্রকাশ সূর্যবন্দনায়। আরো স্তবস্তুতি রচিত হলো বরুণ, অগ্নি, নদী ইত্যাদির উদ্দেশ্যে। এই স্তব স্তুতিগুলি ছিল যজ্ঞাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অবশ্য গেয়। ভারতবর্ষের ঋগ্বেদ সংহিতা এ ধরণের গীতিকবিতার অতুলনীয় ভান্ডার। এ স্তুতিগীতিগুলির উৎস হচ্ছে একান্তই রচয়িতার হর্ষভয়াদি অন্তরাবেগের প্রেরণা।

এর পরের স্তরে এসেছে মহাকাব্য। মহাকাব্যের পরিসর বহুবিস্তৃত, বহির্মুখী, ঘটনা-প্রধান; মহিমময়, সুদৃঢ়, সমুন্নত এর প্রকাশ; নৈর্ব্যক্তিক ও ক্লাসিকেল এর আবেদন। অলঙ্কার ও ধ্বনির সৌষ্ঠবে এবং বহু রসের ও ভাবের চমৎকৃতিতে ইহা সমুজ্জ্বল। কিন্তু গীতিকবিতা অন্তর্মুখী আত্মনিষ্ঠ, ব্যঞ্জনাময় ও সুন্দর; সংহত ও গভীর এর আবেদন। রোমাণ্টিক কবি-

মনের স্বাতন্ত্র্যধর্মের মর্যাদায় ইহা সমুজ্জ্বল। বহু ছন্দের ও সুরের দোলায় ঝংকৃত প্রকাশ। মহাকাব্য 'অবজেকটিভ', গীতিকবিতা 'সাবজেকটিভ'। গীতিকবিতায় কবিমন যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাকে ছাড়িয়ে উঠে চলে ঊর্ধ্বলোকে—আপনার নব নব রূপের অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে করতে। একই সূর্যোদয়ের দৃশ্য বিভিন্ন কবির মানসলোকে ফুটিয়ে তোলে বিচিত্র-বর্ণের ছবি। এটাই কবিমনের সাবজেক্‌টিভিটি। কবি মনের আনন্দ, ভয়, বিস্ময় মিশিয়ে যে রমণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি তাই রোমান্টিক সাহিত্য। তাই স্রষ্টা 'আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে', আপন মনের রঙে রাঙিয়ে, আপন আশাআকাঙ্খার উদ্বেগে স্পন্দিত করে যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন তাহাই গীতিকাব্য বা লিরিক পোয়েম। কবির আন্তরিকতা এ কবিতার মুখ্য। অনুভূতির প্রকাশ এখানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু কোন কবি যদি তাঁর ব্যক্তি অনুভূতিকে অন্তরের দরদ দিয়ে দীর্ঘাকার বর্ণনা করেন তাতেও রসের অযোগান ঘটে না।

গীতিকাব্য রচয়িতারই আত্মমুকুর। এ মুকুরের প্রতিবিম্বন কবিরই অন্তরের ভাবরূপ। কিন্তু গীতিকবিতায় সম্পূর্ণ মানুষটির প্রকাশও নেই। স্রষ্টার একক মনের একটিমাত্র ভাবের অখণ্ডরূপটিই এখানে বাঁধা পড়ে যায়। স্রষ্টা এখানে আত্মাভিমুখ, আবেগ উদ্বেলিত।

"যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ—ঐ যেমন বিদ্যাপতির

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—

সেও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্তভাবের একটী কোন সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা।"
(রবীন্দ্রনাথ — সাহিত্য)

অবয়বের স্থূলতার প্রতি অবহেলা, মাধুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। যদিও গান মাত্রেই গীতিকবিতা, কিন্তু গীতিকবিতা মাত্রেই গান নয়, তবুও সুরের মাধুর্য গীতি-কবিতার সম্পদ। গানে গায়কের আশা আকাঙ্খা, আনন্দ বেদনা, অখণ্ড ভাবরূপ নিয়ে সুরের লহরী সৃষ্টি করে শ্রোতার অন্তর তটে এসে সাড়া জাগায়। শব্দচয়নে গান রচয়িতার স্বাধীনতা নেই, তাল ও লয়ের দাবীই বেশী।

গীতিকবিতায় অসংখ্য ছন্দের, কথা ও সুরের নব নব অভিব্যক্তি, গানে শুধু সুরেরই প্রাধান্য—ছন্দের বৈচিত্র্য নেই। গানের সুরে রয়েছে একটা বেগ, এ বেগের জোরে নিজের মাঝে নিজে সে স্পন্দিত। কাব্যের প্রধান উপকরণ—কথা, কথায় আছে অর্থের কারচুপি, কারণ কথা সুরের মত স্বপ্রকাশ নয়। কথা প্রকাশ করে অর্থকে। শুধু অর্থই নয়—অর্থের চেয়েও আরও কিছু বেশী। এ বেশীটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। আর গানের সুরে বিশ্বের অন্তরলোকে জন্মিয়ে দেয় যে বেদনার কম্পন তারই আলোড়নের ঢেউ খেলে আমাদের চিত্তে। ভৈরবী শ্রোতার প্রাণে আনে তামসীতীরের স্নেগ্ধ প্রেয়সীর সেই চিরন্তন বিরহবেদনা, দেশমল্লার সুরে ভেসে আসে যুগযুগান্তের অশ্রুবন্যার কল্লোল। তাই গানের সুরের মধ্য দিয়ে শ্রোতার চেতনা দেশ-কালের সীমা পার হয়ে শাশ্বতকালের অনুভূতির সঙ্গে এক তারে বাঁধা হয়ে যায়।

গীতিকবিতায় রয়েছে ছন্দের কারসাজি, গানে লয়ের। লয়ের এ যাদুকরী আছে বিশ্ব-সৃষ্টির সর্বত্র। আকাশে সূর্যের উদয় থেকে পৃথিবীর ছোট্ট পাখীটির নীল আকাশের বুকে ডানা মেলে উড়া পর্যন্ত। লয়ের ভারসাম্য রয়েছে বলেই সর্বত্র এমন সুসমঞ্জস, এমন চলার গতি-বেগ। গানও লয়কে রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় তানের শাসনকেও অস্বীকার করে বসে। এ অস্বীকৃতির জবাবদিহি করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং —

"হাল আমলে এ সমস্ত উৎপাত চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানব না। কেননা, যে নিয়ম সত্য সে নিয়ম বাহিরের জিনিষ নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। সে নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।" (ছন্দ)

গান করার উদ্দেশ্যেই প্রথম গীতিকবিতা রচিত। কিন্তু পরের যুগে এসে দেখা গেল উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয়েছে। ছন্দযুক্ত রচনা শুধু আনন্দদায়কই নয় সুখপাঠ্যও। তখন শুধু গানের উদ্দেশ্য গীতিকবিতা রচনা আর হয়ে উঠল না, গীতিকবিতা রচিত হলো পঠনের উদ্দেশ্যে। গান সুরের মায়ালোক সৃষ্টি করে শ্রোতার অন্তরলোকে, আর গীতিকবিতা ভাবের অলকাপুরী বানিয়ে দেয় পাঠকের কল্পলোকে।

গীতি কবিতা ও গান দুইই কবির আত্মবাণী, কবির একান্ত ব্যক্তি অনুভূতির সহজ সাবলীল প্রকাশ। কখনও তা সুরলয় সহকারে গাওয়া হয়, কখনও হয় না।

"গীত হওয়াই গীতিকবিতার আদিম উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্ত ভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অনেক গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। বস্তুর ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতি কাব্য। অতএব ,গীতের যে যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য।" —বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যের প্রথম অঙ্কুর মিলেছে চর্যাপদে। তাতেও স্থানে স্থানে গীতিকবিতার ধর্ম বজায় রয়েছে, যদিও তা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। এর জন্য চর্যাকারদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ বিশেষ কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচারের বাহন হয়েই এ পদগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। তবুও মাঝে মাঝে গীতি কবিতার আঁচ মিলে—

"জোইনি তঁই বিনু খনহি ন জীবমি
তো মুহ চুম্বি কমলরস পিবমি

উঁচা উঁচা পাবত তা হিঁ বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোরি
নিঅ ঘরিনী নামে সহজসুন্দরী।

এ দিক হতে বিচার করলে বাংলা দেশে রচিত অপভ্রংশ কবিতার কৃতিত্ব চর্যাপদের চেয়েও ঢের বেশী। প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থের স্থানে স্থানে গীতি কাব্যের সুর একান্তই সুস্পষ্ট। ছন্দমাধুর্য ও রসসৃষ্টিতে এরা অতুলনীয়। যেমন —

১. কাঅ হউ দুব্বল তেজি গেরাস।
খনে খনে জানিঅ অচ্ছ নিসাস।
কুহু রব তার দুরন্ত বসন্ত।
পিন্দঅ কাম কি পিন্দঅ কন্ত ।।

২. সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা
পাউস আএ
চৈউ চলাএ ॥

৩. নবি মঞ্জুরি লিজ্জিঅ চুঅই গাচ্ছো।
পরিফুল্লিঅ কেসু-লআ বণ আচ্ছে ॥

জই ইঁহ দিগন্তর জাইহ কন্তা।
কিই বম্মহ ণাঁহ বসন্তা ॥

কবি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের প্রথম অধ্যায়ের রচনা। কাব্য ও নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে এ গ্রন্থে। কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে পাঠকের মনে চমক সৃষ্টি করে গীতি কবিতার দ্যুতি। নায়ক নায়িকার উক্তি প্রত্যুক্তি, ব্যথা বেদনা গীতি-কবিতার আবেদন নিয়ে প্রকাশ হয়েছে নীচের স্তবক সমূহে ঃ—

"কেনা বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নঈ কুলে .....
"দিনের সুরজ পোড়াআঁ মারে .....
"মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী .....

বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা গীতি কবিতার অফুরাণ খনি। এ সাহিত্যে এমন পদও আছে, সঙ্গীত-রূপে গীত না হলে যার যথার্থ রস পাওয়া যায় না। শুধু সুর বা রাগরাগিনীই এ গানের মুখ্য নয়। বৈষ্ণবকবির গানে রয়েছে নিজস্ব অর্থ গৌরব। ছন্দের মাধুর্য্য ও নানা মিলের বিন্যাসের বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই ধরা পড়েছে রাধা কৃষ্ণের প্রেম বৈচিত্র্যের নানাভাবের সমারোহ। সে যুগের আখ্যানকাব্য সমূহের মাঝেও কখনও কখনও কবি মনের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য একেবারে যে ধরা পড়েনি তা নয়। যদিও আখ্যান কার্যের কবি মনের objectivity-র দিক টাই বেশী করে ধরা দেয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেবীর কাছে ফুল্লরার দারিদ্র্য বর্ণনায় ময়নামতীর গানে গোপীচন্দ্রের গানে গীতিকাবিতারই গৌণ আভাস।

আখ্যানকাব্য ও বৈষ্ণবকাব্যের যুগ পার হয়ে কানে আসে সাধক কবি রামপ্রসাদের মনোরম সুরধ্বনি। তিনি একাধারে শাক্ত কবি ও গায়ক দুইই। কবিদের ওপর বৈষ্ণবকবির প্রভাব রয়েছে তা স্বীকার করি। তাহলেও শক্তি কবিতার আবেদন গিয়ে পৌঁছয় বাঙ্গালীর অন্তরের অতি গভীরে। এ আবেদন আমাদের প্রাণে যেমন সাড়া জাগাতে পারে তেমন আর কিছুতে নয়। রামপ্রসাদের গীতি কবিতার প্রায় অধিকাংশই গানের পর্যায়ে স্থান করে নিয়েছে। যেমন —

"মা মা বলে আর ডাকব না .....
"কত রঙ্গ জান তারা .....
"মন, তোর এত ভাবনা কেনে? .....ইত্যাদি।

বাংলাদেশের এক বিশৃঙ্খল অরাজকতার যুগে, এসে কবিওয়ালা ও পাঁচালীওয়ালাদের আবির্ভাব। দেশের মাটিতে তখন প্রণয়রসের যোগান কমে এসেছে। বিরাট মহীরুহের জন্মদান তাই হয়ে উঠল না—বাংলা সাহিত্যের আসর ভরে উঠল শুধু আগাছায়। এদের গানে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ নেই, আছে বুদ্ধির দীপ্তি, আন্তরিকতার স্পর্শ নেই, আছে কৌশল ভাবের গভীরতা নেই, আছে সাঙ্কেতিকতার জৌলুস, আর অনুপ্রাস যমকের ছড়াছড়ি। তাই এঁদের অধিকাংশই আদর্শ রচনা গীতি কবিতার পর্য্যায়ে স্থান পেতে পারল না। তাহলেও উচ্চ স্তরের ভাবগম্ভীর গীতিকবিতা যে তাঁদের হাতে একেবারেই সৃষ্টি হয়নি তা নয়। যেমন —

"সাধিলে করিব মান কত মনে করি
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি (নিধুবাবু)
মনে রইল সই মনের বেদনা
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হল না" — (রামবসু)

ভালবাসিবে বলে, ভালবাসিসে
আমার সে ভালবাসা তোমা বই জানি সে ....(শ্রীধর কথক)

পল্লীবাংলার প্রান্তে প্রান্তে উপভাষাকে কেন্দ্র করে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি। পাড়াগেয়ে কবির পালা গানের ছন্দ 'শিশুর আধ বুলির মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা—পূর্ণতা পায় নাই।' পল্লীর আসরে গানের উদ্দেশ্যেই এ গাথাগুলি রচিত। কঙ্ক ও লীলা গাথায় লীলার বিলাপ, চন্দ্রাবতীতে জয় চন্দ্রের বিদায়বাণী কমলা গাথায় প্রদীপকুমারের প্রেম নিবেদন উচ্চশ্রেণীর না হলেও সুন্দর গীতি কবিতা।

আধুনিক কালে রচিত গীতি কবিতায় ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব খুব বেশী।* মহাকবি মাইকেল থেকে তার সূচনা। ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের অমর দান। এতদিন বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা রচিত হচ্ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেম বা নরনারীর ব্যক্তিগত প্রেম, বিরহ মিলনের ভাবকে নিয়ে। মাইকেল সে ধারার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। বিহারীলাল এসে নূতন ধারায় আনলেন নূতন প্রাণস্পন্দন। বিহারী লালের সারদা একান্তই সরস্বতী নহেন, আবার কোন সাধারণ মানবীও নহেন। তিনি একাধারে বিশ্বের সৌন্দর্যরূপিণী লক্ষ্মী, কাজের প্রেরণাদায়িনী বাক্স্বরূপিণী সরস্বতী আবার কবির অন্তর বাসিনী মানসীপ্রতিমাও। এ হৃদয়প্রতিমাকে লক্ষ করে কবি লিখেছেন—

"জীবন জুড়ান ধন হৃদি ফুল হার
মধুর মুরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব
সম্মুখে যে মুখখানি জাগে অনিবার
কি জানি কি ঘুম ঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।"

বিহারীলালের পরেই বাঙলা সাহিত্যে রবির উদয়ে আলোর প্লাবন জেগেছিল। আর এ প্লাবনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল দিকচক্রবালের তটরেখা পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতিকবিতাকে দিলেন নূতন ঐশ্বর্য, বিচিত্র ছন্দ সুষমা, বচনভঙ্গীর (পোয়েটিক ডিক্‌শ্যন) মহিমা ও লালিত্য আর স্তবকবন্ধের বৈশিষ্ট্য। তিনি গীতিকবিতা ও গানের সম্রাট। প্রভাত সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যে গীতি কবিতার সুপ্রভাত ঘোষণা। ক্রমশঃ মানসী, সোনার তরী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলিতে বঙ্গভারতী সমাদৃতা হলেন বিশ্ব বাসীর সভায়। তাঁর রচিত অনেক গীতি কবিতাকে তিনি সুর দিয়েও গেছেন। যেমন—

"ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়···

রবীন্দ্রনাথ অনেক গীতিকবিতা গানের আকারেও লিখে গেছেন। এ গান কবিমনের কোন বিশেষ ভাবরূপ নয়—কেবল কবি মনের সহজ আনন্দ বেদনার বাঙময় প্রকাশমাত্র। "আজি শারদ তপনে প্রভাত স্বপনে" ইত্যাদি কবিতায় ক্লাইমেক্স-এ পৌঁছানোর মত একটিমাত্র ভাবের আবেদন নেই।

রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে বিশেষ করে ঋতুউৎসব অচলায়তন, রাজা ইত্যাদি নাটকে এমন অনেক গান রয়েছে যেগুলিকে নাটকীয় পরিবেশন থেকে আলাদা করে নিলেও তাদের বৈশিষ্ট্যের অপচয় ঘটে না। যদিও তারা নাটকের বিষয়বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে বিশেষ করে জড়িত। যেমন — "আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান····

"তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে··

"আর নহে আর নয়।
আমি করি নে আর ভয়। ..

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার বিষয়ও আলোচ্য। লিপিকার কথিকার স্তবকগুলিকে কবি যথেচ্ছ ভাবে সাজান নাই। ছন্দ রসিকদের মতে ছত্রগুলিকে যতি অনুসারে কবিতার মত করেও সাজানো চলে। যেমন —

"এখানে নামল সন্ধ্যা ॥ সূর্যদেব ॥ কোন দেশে । কোন
সমুদ্রপারে । তোমার প্রভাত হল ॥
অন্ধকারে এইখানে । কেঁপে উঠেছে রজনীগন্ধা ॥
বাসর ঘরের । দ্বারের কাছে । অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ॥
কোনখানে ফুটল । ভোর বেলাকার কনকচাঁপা ॥
জাগল কে ॥ নিবিয়ে দিল । সন্ধ্যায় জ্বালানো । দীপ ॥
ফেলে দিল । রাত্রে গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা ॥

রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ গীতিপ্রতিভা যিনি একদিন

"অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে"

লিখে কবিতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন তিনিই দিলেন গীতিকবিতাকে ছন্দের গতানুগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি। পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট গদ্যছন্দে লেখা হলেও ভাবব্যঞ্জক, ও রসসমৃদ্ধ। গীতি কবিতার ইতিহাসে গদ্যকবিতা আর একটি নূতন যুগের সূচনা।

তাল গোণা ও সুর শোনা

একখানি ঘরের পরিচয় দিতে হলে যেমন লম্বা চওড়া ও উচ্চতা জানাতে হয়, যেকোন সংগীত কর্মের পরিচয় দিতে হলে ঠিক তেমনই জানাতে হয় তার সুর ও তাল। কণ্ঠ সঙ্গীতে ভাষার যোগ হয়। জ্যামিতির ভাষায় প্রস্থের পরিমাপকে সরিয়ে রেখে একটি সরল রেখার অস্তিত্বকে যেমন অনুমান করাই সম্ভব সুর থেকে আলাদা করে তালের চিন্তাও অনুরূপ অনুমান সাপেক্ষ। দেখাতে গেলেই যেকোনও দুটি জিনিসের মধ্যে ঠোকাঠুকি হয়ে আওয়াজ ওঠানোর দরকার। আসলে তালকে দেখাতে গেলেই শব্দের প্রয়োজন অর্থাৎ সুর ছাড়া তালের প্রকাশ নেই,—আছে অনুভূতি।

ছন্দ বা তাল মানুষের অন্তর্ভাবের বহিঃপ্রকাশ। চেতনার জগতে প্রত্যেকেরই জীবন-যাপনের একটি ছন্দ আছে। সেই ছন্দ শুধু দিনরাতের সময়ের হিসাবে নয়,—ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, উচিত-অনুচিত কর্ম-বিরতির মধ্যে নিত্যই ধ্বনিত হচ্ছে। প্রত্যেক মানুষের চেতনার মধ্যেই ছন্দ বৈশিষ্ট রয়েছে। দুটি মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার ফলে যেমন একটি ছন্দ আর একটিকে অনুপ্রাণিত করে, কোনও গানের মধ্যে তাল প্রয়োগের প্রক্রিয়াতেও এই কাজটি অনুষ্ঠিত হয়। ভাষার কাব্যছন্দটি গানের মধ্যে ভাব প্রয়োগের উচিত মত না হলেই সুরকার কাব্যছন্দটি বদলিয়ে ভাবানুগ ছন্দের অমাদানী করেন। বাংলা সঙ্গীতে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এর উদাহরণের অভাব নেই। উত্তর ভারতীয় হিন্দী সঙ্গীতেও এই নীতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকারেরা মেনে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বৈজুবাওরার একখানি রচনার কথা বলি। গানখানি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত। গানখানির প্রথম কয়েকটি কথা হল "বোলিও না ডোলিও সঙ্গে আউ হুঁ প্যারী কো, শুনহো সুখরবর—অবহি মায় যাঁউ হুঁ।" গানখানি ১৬ মাত্রার ঠুংরী হলে প্রেম সঙ্গীত বেশ জমত বটে কিন্তু তার আধ্যাত্মিক রূপ ফোটবার জন্যই বোধকরি বৈজু ঝাঁপতালের গম্ভীর ছন্দটি বেছে নিয়েছিলেন।

গানের ছন্দের প্রধান কাজই হল প্রত্যেকের অন্তরের ছন্দকে সুরের ছন্দের মধ্যে দিয়ে অনুপ্রাণিত করা। আদিম অধিবাসিদের মধ্যে ড্রাম বাজানোর ছন্দের মধ্যে দিয়ে সৈনিকদের যুদ্ধের অনুপ্রেরণা যোগানোর রেওয়াজ এখনও অন্তর্হিত হয়নি। মার্চের পদক্ষেপের তালের মধ্যে দিয়ে পথশ্রমের ক্লান্তি ঘোচানোর রীতি এখনও রয়েছে। সিনেমা, থিয়েটারের আবহসঙ্গীত রচনার কালে নাট্যরস ফোটাবার জন্যে তালের ছন্দ বিশেষ করে বেছে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের গীতি নাট্য ও নৃত্য নাট্যের মধ্যে এই জন্যই ঘন ঘন তাল ও লয়ের পরিবর্তন হয়ে থাকে। বাঙ্গলার পালাকীর্তনের মধ্যেও এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

মোটামুটি দেখা যায় যে দ্রুতগতির ছন্দ মানুষের বীররস, রৌদ্ররস ও ভয়ানক রস দ্যোতক। শান্ত ও করুণ রসে শ্লথ গতির ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। শৃঙ্গার রস উজ্জ্বল রসাত্মক। তাই বিভিন্ন ব্যভিচারী ভাবে বিভিন্ন ছন্দের পরিকল্পনা দেখা যায়। সেখানে শ্লথগতি বা দ্রুতগতি উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

গতি ছাড়াও ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট আছে। সেটি হল বৃত্ত। যতি বা মাত্রা সমান হয়েও বিভিন্ন বৃত্তের মাধ্যমে বিভিন্ন তালের সৃষ্টি। এই বৃত্ত ভেদে রসেরও ভেদ হয়। আমাদের ভারতীয় সংগীতে তাল ও ছন্দ বৃত্ত ভেদে বহুতর এবং দুই মাত্রার বৃত্ত থেকে ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০. ১১ ইত্যাদি বহুতর মাত্রার বৃত্ত তালের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এই খানেই পাশ্চাত্য সংগীতের "রীদম" ও আমাদের তালের মধ্যে তফাৎ। পাশ্চাত্য রীদ্‌ম্‌ প্রধানতঃ কেবল মাত্র দুই বা তিন মাত্রাকে কেন্দ্র করে। দুই ও তিনমাত্রার মিশ্রণে অর্থাৎ পাঁচ মাত্রায় রাশিয়ান সুরকার চেকভেস্কী যখন তার প্যাথেটিক সিম্ফনী রচনা করেন এবং ষ্ট্র্যাভেনস্কী যখন বিষম ছন্দে নিত্য নূতন রচনা করতে থাকেন ইউরোপীয় সংগীতবিদেরা তখন সেগুলি সুকর্ণে গ্রহণ করেন নি। ছন্দের বৈচিত্র অপেক্ষা লয়ের বৈচিত্রই রীদমের মধ্যে বড়। এই লয় বা টেম্পোর পরিমাপ পদ্ধতিও "মেট্রোনোম" যন্ত্রটির মাধ্যমে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। লয় পরিবর্তন করেই তাঁরা রসাভাবের বৈচিত্র আনেন। বিলাতী "রক্‌ এণ্ড রোল" এর দ্রুত ছন্দ এমনি করেই মানুষের জীবনছন্দকে নাচিয়ে তোলে এবং তারই প্রকাশ হয় প্রায়শঃ অশ্লীল অঙ্গবিক্ষেপের মাধ্যমে। ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে ভাবগম্ভীরতা আনতে হলে ঢিমা লয়ের ছন্দের প্রচলন আছে বটে কিন্তু তার চেয়ে অধিক সহায়ক অর্দ্ধসমপদী তালগুলি। অর্দ্ধসমপদী তাল বা সমপদী তালের যদৃচ্ছ ব্যবহার ভারতীয় সংগীত ব্যাকরণের অনুমোদিত নয়। ছন্দের কাজ হল সর্বপ্রথম সুর বা ভাষার ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা তাই তারও একটা বিহিত সীমা থাকা দরকার। বিষয়-টিকে আর একটু পরিস্কার করা যাক।

স্বরের এক নিমেষকাল স্থিতিকে যদি ছন্দের যতি বা মাত্রার প্রাথমিক পরিমাপ হিসাবে ধরা যায় তাহলে যেকোনও সংগীত কর্মের ব্যাপ্তিকে এই একমাত্রার বিভাগে ভাগ করা চলে। তানসেনের বিখ্যাত "বংশীধুন সো বজাই" গানটির স্থায়ী অংশে রয়েছে ৪৮ মাত্রা। এই মাত্রা-গুলিকে কোনও বৃত্তের ভাগে না ভাগ করে কেবল এক মাত্রার ভাগে গান করে গেলে গানের যেখানে ইচ্ছা বিশ্রাম নিয়ে যদৃচ্ছাক্রমে গাওয়া চলে। এর ফলে স্থায়ী অংশের কলেবর বেড়েই চলবে। রূপ ফোটানোর অসুবিধা হবে। দুই তিন বা চার মাত্রার বৃত্তে গানটিকে প্রকাশ করতে হলে প্রতি দুই বা তিন বা চার মাত্রার পরই গানের মধ্যে ঝোঁক দিয়ে বৃত্তগুলিকে ফোটাতে হবে। কিন্তু দুই বা তিন বা চার মাত্রার বৃত্তগুলি এতই স্বল্প পরিসরের মধ্যে যে তার মধ্যে সুরের সম্পূর্ণতা দেখবার অবসর নেই। সম্পূর্ণতা আনবার জন্যে বৃত্তগুলিকেও যদৃচ্ছ বাড়াতে হতে পারে সুতরাং এখানেও সুরের রূপটিকে ধরা মুস্কিল। সেই জন্যই এই ছোট বৃত্তগুলি আবার বৃহত্তর বৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই গানটি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে রচয়িতা ১২ মাত্রার তাল, দুই মাত্রার বৃত্তে ও চারটি তাল ও দুইটি ফাঁকের মাধ্যমে প্রকাশ করে সুর ও ভাষার যাথার্থ কতখানি বাড়িয়ে তুলেছেন এবং শ্রোতার মনে একটা সম্পূর্ণতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন। এই সম্পূর্ণ-অনুভূতি ততই স্পষ্ট হবে যতই সেই বৃত্তটি থাকবে অটুট। বিদগ্ধ শ্রোতা যখন মনে মনে তাল গণনা করে সমের মুখে মাথা ঝাঁকান তখন বোঝা যায় যে তিনি সেই সম্পূর্ণ অনুভূতিরই বহিঃ প্রকাশ দেখাচ্ছেন। আংশিক ভাবে তাই এই তাল গণনার ব্যাপারটাকে উৎকট রুচি বলে সব সময় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এখন এই গানখানি যদি দুই মাত্রার বৃত্তিতে, প্রথম তালটি দশমাত্রায়, দ্বিতীয় তালটি ১২ মাত্রায়, তৃতীয় ও চতুর্থ তালদুটি যথাক্রমে ১৪ ও ১২ মাত্রায় করা হয় তাহলেও এই সম্পূর্ণতার উপলব্ধি হবে না। বৃত্ত ভাগের প্রথম কথা হল সমপরিমাপের বৃত্ত। কেন তাই বলি।।

মাত্রার প্রাথমিক পরিমাপ বা ইউনিট যদি এক নিমেষকাল বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে গান শোনবার সময় শ্রোতা অন্ততঃপক্ষে একনিমেষকাল পিছিয়ে পড়ে থাকে। সংগীত কর্মের ব্যাপ্তিকে শ্রোতা মনে মনে মাত্রা বিভক্তি করে নিয়ে প্রত্যেক নিমেষকাল সুরের ব্যাপ্তিকে তার ঠিক আগে সুরের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখে। সুরের রঞ্জনশক্তি ঠিক এমনি করেই শ্রোতার মনে যাচাই হতে থাকে। তারপরই হল স্বরের স্থায়ীত্বকাল। যে কোনও সুরের ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট নির্ভর করে স্বর বিশেষের স্থায়ীত্ব কালের পরিমাপের ওপর এবং স্থায়ীত্ব কালের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করতে হলেই সমপরিমাপ মাত্রা বিভক্তির প্রয়োজনে। এবং এই মাত্রার বৃত্তগুলিও সেই একই কারণে সমপরিমাপের হওয়া প্রয়োজন।

উত্তরভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য যদিও অধুনা প্রায়ই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রাগ রাগিণীর ব্যবহৃত স্বরগুলি এবং গলার কর্তব দেখানোর উদ্দেশ্যে বৃত্তটির বিলোপ করা হয় এবং গানের যে অক্ষরটির উপর "সম" কেবল সেই অক্ষরটির দিকে লক্ষ্য রেখে সম মিলানো হয়। এইজন্য অনেক সময় সুরের রূপটি প্রয়োগ শিল্পী যথার্থ পরিস্ফুট করতে সমর্থ হয়না এবং শ্রোতাদেরও হয় বিশেষ অসুবিধা। সুরারোপ এবং তার প্রয়োগ যেখানে তালের বৃত্তকে বজায় রেখে এগিয়ে যাবে সেখানে যদি শ্রোতাকে আঙ্গুল দিয়ে মাত্রা গুণে বৃত্তটিকে বুঝতে হয় তাহলে গানটির সামগ্রিক সুষমা খুঁজে পাওয়া শ্রোতার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেখানেই কৌশল যায় কলাকে ছাপিয়ে।

বাংলা "আধুনিক" গানগুলির তালের বৃত্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্প পরিসর দেখে বেছে নেওয়া হয় এবং ভাষা বা সুর যাই হোক না কেন দ্রুত লয়ের মাধ্যমে প্রয়োগ করার ফলে তিন বা চার মাত্রার বৃত্তগন্ধী তালগুলির মধ্যে লঘু ও চপল ভাবের আমদানী হয়। শ্রোতার মনের মধ্যে এই লঘু বা চপল ভাব মনের নিজস্ব ছন্দটিকেও দেয় দুলিয়ে এবং তারই বহিঃপ্রকাশ হয় ছোট ছোট অঙ্গবিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রোতারা তাই ঘন ঘন ঘাড় হাত বা পা নাড়তে থাকেন। কেউ বা শরীর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গী করেন। গানের ভাষা অনুকূল হলেই এই ধরনের তালের প্রয়োগ গানটিকে বেশ আদিরসাত্মক করে তোলে। অর্থহীন ভাষা যেমন "ইচক দানা বিচক দানা" বা "হল্লাগুল্লা হল্লা লা" ধরনের গানগুলি শ্রোতার মনে কেবলমাত্র কতকগুলি ইঙ্গিতের আভাষ দেয়। এই গানগুলিকে অশ্লীলতার পর্যায়ে ধরা চলে বৈকি!

ঠিক এমনি ভাবে ভারতীয় সংগীতে তালের আধিপত্য রয়েছে। কিন্তু তাল ও সুর গানের মধ্যে এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে কাজ করে যে একটি ছেড়ে অন্যটির পরিকল্পনা সংগীতকর্মের সম্পূর্ণতা প্রকাশের পরিপন্থী। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তাল ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিয়ে গিয়েছেন সংগীত কর্মের ভাবকে লক্ষ্য করে। সংগীতের বিবর্তনের ফলে এই নির্দ্দেশ হয়ত আমরা ভুলেছি কিন্তু তালের তাৎপর্য ভুলিনি তাই এখনও আমরা বিভিন্ন রকমের তাল ব্যবহার করি। তালের ব্যবহার কিন্তু সংগীতকর্মটির সুরের মুখাপেক্ষী তাই সেই তালের মাধ্যমে সুরের রঞ্জনাটিকে শ্রোতাদের বুঝে নিতে হবে। ভারতীয় সংগীতে এই সুরের রঞ্জনার পরি-প্রেক্ষিতে এই রঞ্জন পদ্ধতিটিকেও শ্রোতার বুঝে নেওয়া দরকার। তাল সুরের এই রঞ্জনাশক্তিতে বা রাগকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী—পূর্বানুবৃত্তি

চৈত্র ১৩৩৪

শাল
বনবাণী

স্বরলিপি
মনে রবে কিনা রবে আমারে
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ২
চরণরেখা তব
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ২

পরিণয় মঙ্গল
পরিশেষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংযোজন

তরুণে সাহিত্যিক
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একখানি পত্রের কিয়দংশ
'শনিবারের চিঠি' (মাঘ) হইতে 'সংকলন' বিভাগে পুনরুদ্ধৃত
অপ্রকাশিত

বৈশাখ ১৩৩৫

উদ্বোধন
মহুয়া, বোধন

পল্লিপ্রকৃতি
২৩শে মাঘ শ্রীনিকেতন অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপদেশ
বিশ্বভারতী পত্রি নম্বর ১০
অপ্রকাশিত

কুটিরবাসী
বনবাণী

স্বরলিপি
হে মাধবী, দ্বিধা কেন
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ৫
এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ!
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরবিতান ২

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

স্বপ্ন
স্বপনপারের ডাক শুনেছি
গান

মায়া
আমার মাঝে তোমারি মায়া
গান

নারীর মনুষ্যত্ব
পত্র। "মেয়েদের সম্বন্ধে যে লেখাটি লিখেচ আমার....." ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৫
অপ্রকাশিত

স্বরলিপি
রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ১

দ্বিতীয় বর্ষ। আষাঢ় ১৩৩৫—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

আষাঢ় ১৩৩৫

সুসময়
পরিশেষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংযোজন

তেল আর আলো[১]
আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬ সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' হইতে পুনরুদ্ধৃত
অপ্রকাশিত

স্বরলিপি
দিনশেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল ব'লে,
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ৩

শ্রাবণ ১৩৩৫

আশীর্বাদ
কবির হস্তাক্ষর-প্রতিলিপি
পরিশেষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংযোজন

অতিথি

---

১ এই সময় হইতে, শান্তিনিকেতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রচারিত পত্রিকা হইতে কতকগুলি রচনা বিচিত্রায় মুদ্রিত হইতে থাকে। দুঃখের বিষয়, এগুলি যে পুনর্মুদ্রণ, তাহার কোনো ইঙ্গিত বিচিত্রায় নাই। এই তালিকায় যথাসাধ্য তাহার নির্দেশ দেওয়া গেল। কোনো কোনো রচনা মূলতঃ সাধু ভাষায় রচিত হইলেও বিচিত্রায় চলিত ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে।

'শান্তিনিকেতন' পত্র, চৈত্র ১৩২৬ হইতে পুনর্মুদ্রিত
অপ্রকাশিত

ভা দ্র ১ ৩ ৩ ৫
শেষ কথা
মহুয়া, বিরহ
কাজ কাজ খেলা
পত্র
শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ?
অপ্রকাশিত

আ শ্বি ন ১ ৩ ৩ ৫
পত্র
যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ৬ ও ৮

কা র্তি ক ১ ৩ ৩ ৫
চিরন্তন
পরিশেষ
আনন্দের সন্ধান
১৩২৬ আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত
শেষ অনুচ্ছেদ বর্জিত
অপ্রকাশিত
প্রেমাস্পদা
জাভায় অবস্থানকালে স্থানীয় অধিবাসীগণ কর্তৃক গীত গানের কবি-কৃত গদ্যছন্দে অনুবাদ
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য
শরৎ-প্রশস্তি
৩১ ভাদ্র কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে শরৎচন্দ্রের ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে
সভায় রবীন্দ্রনাথের পত্র
অপ্রকাশিত

অ গ্র হা য় ণ ১ ৩ ৩ ৫
মোহানা
পরিশেষ
মনের চালনা
১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত
অপ্রকাশিত
স্বরলিপি
জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার জানি
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ২

পৌ ষ ১ ৩ ৩ ৫
বীজ-ধর্ম

১৩২৬ আষাঢ় সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত
শান্তিনিকেতন ২ (১৩৪২ সংস্করণ)
বন্ধু
পৌষ ১৩৩৫ প্রবাসীতেও মুদ্রিত
বনবাণী, জগদীশচন্দ্র

মা ঘ ১ ৩ ৩ ৫
কল্যাণ
১৩২৬ ভাদ্র সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত
শান্তিনিকেতন ২ (১৩৪২ সংস্করণ)

ফা ল্গু ন ১ ৩ ৩ ৫
বিদ্যাসমবায়
১৩২৫ আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত
চলিত ভাষায় রূপান্তরিত
শিক্ষা (১৩৫১ সংস্করণ)

চৈ ত্র ১ ৩ ৩ ৫
মিলনের সৃষ্টি
১৩২৬ আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত
শান্তিনিকেতন ২ (১৩৪২ সংস্করণ)

বৈ শা খ ১ ৩ ৩ ৬
ঙ
শ্রীদ্বারকানাথ দত্তকে লিখিত পত্র। ৩রা বৈশাখ ১৩৩৪
অপ্রকাশিত
সুর-ফাল্গু
১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত
সন্ধ্যায় মন্দিরে উপদেশ
শান্তিনিকেতন ২ (১৩৪২ সংস্করণ)

জ্যৈ ষ্ঠ ১ ৩ ৩ ৬
স্ত্রী-শিক্ষা
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্তকে লিখিত পত্র
১৭ ফাল্গুন ১৩২৮
অপ্রকাশিত
আকাঙ্ক্ষা
১৩২৬ পৌষ সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত
শ্রীহট্ট কলেজ হস্‌টেল ছাত্রদের আহ্বানে যে বক্তৃতা করেন তাহারই সারমর্ম
অপ্রকাশিত

পুলিনবিহারী সেন
পার্থ বসু

রাজশেখর

রাজশেখর বসুর মৃত্যুতে আমরা বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যংগরসাত্মক রচনার সুরসিক শিল্পীকে হারালাম। তিনি পরশুরাম।

সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙলাদেশের সাহিত্য পাঠকের মনোহরণ করেছেন পরশুরাম তাঁর ব্যংগাত্মক, হাস্যরসমুখর রচনায়। বাঙলাসাহিত্যে ট্রাজিক রসের আধিক্য সর্বজনস্বীকৃত। সেই বোবা কান্নার শুষ্ক মরুভূমিতে হাস্যরসের ওয়েসিস যাঁরা এনেছেন, পরশুরাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ইদানীং কালে বুঝিবা তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। সেই গুরুগম্ভীর রসায়নশাস্ত্রবিদের অন্তরালে প্রবাহিত হয়েছিল হাসির ফল্গুধারা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই চিনতে পেরেছিলেন এই রসিকচূড়ামণিকে।

ঊনিশ শতকে যেমন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্যাটায়ার রচনা করে জাতিকে আঘাত দিতে চেয়েছেন, জাগাতে চেষ্টা করেছেন, বিশ শতকে তেমনি হিউমারের মাধ্যমে পরশুরাম বাঙলার দুঃখ-জ্বালা চিন্তাপীড়িত পাঠকের মনে কিঞ্চিৎ শান্তিবারি সিঞ্চনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর রচনায় আঘাত তেমন নেই, জ্বালা নেই, ব্যংগ আছে বিশুদ্ধ হাস্যরস আছে।

সমসাময়িক কালের কাছ থেকে জীবিতাবস্থায় যে শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও আন্তরিকতা রাজশেখর বসু পেয়েছেন সে অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে। প্রবীণতম সাহিত্যিক হিসেবে জীবনের শেষদিন পর্যন্তও বাঙলাদেশের অনুজ কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ ও দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান তিনি লাভ করেছেন। এখানেই তাঁর জীবন সার্থক, সাহিত্যসৃষ্টি সফল।

উত্তরযৌবনে সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন রাজশেখর। প্রথম রচনা প্রকাশের সংগে সংগেই বাঙলা সাহিত্যে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুগম্ভীর বিজ্ঞানবিদ, লঘুচপল রচনার মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যাকাশে উদিত হলেন। তাঁর মধ্যে দেখি বৈপরীত্যের সমাবেশ। সেখানে বিরোধ নেই, আছে সহাবস্থান। একদিকে 'চলন্তিকা' অভিধান সংকলন, বানান সংস্কার, রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদ, অন্যদিকে ভিন্নধর্মী লঘুরচনা কজ্জলী, গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্ন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তোলে। প্রতিভার এই বিভিন্নমুখিতা আধুনিককালে বিরল।

বাঙলা ভষার প্রতি তাঁর দরদ প্রথম থেকেই দেখা যায়। রসায়নে এম. এ পাশ করে তিনি বেংগল কেমিকেলে রাসায়নিক হিসেবে যোগ দেন। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভারও তাঁকে নিতে হয়। এখানে তিনি বাঙলায় হিসাবপত্র রাখার নিয়ম করেন, এমন কি ওষুধপত্রের নামও বাঙলায় রাখবার চেষ্টা করেন।

প্রথম রচনা শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড একটি ব্যংগাত্মক কাহিনী। এরপর সাহিত্য সাধনার কোন ইচ্ছা না থাকলেও তাগাদায় পড়ে তাঁকে মসীচালনা করতে হয়েছিল। খ্যাতির বিড়ম্বনা। জলধর সেন, রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যরচনার প্রথমদিকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

হিন্দী, তামিল, তেলেগু ও কানাড়ী ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। চাকুরীজীবন

থেকে অবসর গ্রহণের পর নিশ্চিন্ত শান্ত বিশ্রাম তাঁর জীবনে ঘটেনি। নানা কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা ও বানান সংস্কার সমিতির সভাপতিত্ব করেন, অতঃপর পশ্চিমবংগ সরকারের সরকারী কার্যের পরিভাষা সমিতির সভাপতি হন।

রাজশেখর বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী পদক ও জগত্তারিণী পদক লাভ করেছেন। রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। অতঃপর ভারত সরকারের সম্মান 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট উপাধি দিয়ে এঁকে সম্মানিত করেন। দেশ ও দেশবাসী তাঁকে সম্মানিত করতে পেরে ধন্য হয়েছে। রাজশেখর বসু লোকান্তরিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু আমাদের মনে তাঁর আসন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

হরেন ঘোষ

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আকস্মিক মৃত্যুতে আধুনিক কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি তার একজন প্রবক্তার তিরোধান হল। মাত্র তিন চার বৎসর পূর্বে আমরা এমনই আকস্মিকভাবে হারিয়েছিলাম কবি জীবনানন্দ দাশকে যিনি কবি কর্মে সুধীন্দ্রনাথের ঠিক বিপরীতধর্মী হলেও তাঁরই মত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ছিলেন ভাস্বর। কবিকর্মে বিপরীতধর্মী হলেও একটি বিষয়ে দুজনেরই ছিল অপূর্ব সাদৃশ্য—কবিতা ছিল উভয়ের প্রাণধর্মবিশেষ এবং প্রায় তিন দশকের অধিক কবিজীবনেও নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে, তাঁরা স্বধর্মচ্যুত হন নি। আর একটি বিষয়েও দুজনের মিল ছিল—সেটা হল তাঁরা কেউ জনপ্রিয় কবি ছিলেন না। অর্থাৎ যুগের কাছ থেকে নগদ বিদায় পাবার আশায় তাঁরা কোনদিন নিজেদের নিগূঢ় কবিধর্মকে বাজারের পণ্য করে তোলেন নি। তাই তথাকথিত জনপ্রিয়তার শিরোপা তাঁদের ভাগ্যে না জুটলেও সম সাময়িক কালের কাব্য, মননশীলতা ও রচনারীতির উপর তাঁরা যে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তার তুলনা মেলে না।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ে অ্যালডাস হাকস্‌লির প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্টের' নায়কের উক্তি। এ বই-এর নায়ক এমন একজন ঔপন্যাসিক যাঁর উপন্যাস যুগ পাঠ্য নয় বলেই সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। যাঁদের উপন্যাস বেরুলেই সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায় তাঁদের নজির তুলে ধরে নায়িকা প্রশ্ন করেন নায়ককে : "তুমি কেন এমন জনপ্রিয় বই লিখতে পারনা ?" তদুত্তরে ঔপন্যাসিক নায়ক (ওরফে হাক্সলি স্বয়ং) যা বলেন তার অর্থ এই যে তাঁর মানসিক গঠন এমনই যে তাঁর পক্ষে জনপ্রিয় বই লেখা সম্ভব নয়। তিনি জেনে শুনেই এমন বই লেখেন যার পাঠক সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও অনেক অনেক কম। সুধীন্দ্রনাথের কবি-সত্তাও ছিল এমনই। তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের ধ্রুপদী দুরূহতা যার গায়ে ধাক্কা লেগে সাধারণ পাঠক পাঠিকাকে বিমুখ হয়ে ফিরতে হয় তা ছিল তাঁর স্বভাবজ। এ ছাড়া অন্য ভাবে আত্মপ্রকাশের উপায় ছিল না তাঁর। ধ্বনি প্রধান যে ঋজু গদ্যের তিনি প্রবর্তক সেখানেও দেখি তাঁর কবি-সত্তার এই সহজ প্রক্ষেপণ। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যরীতি তাই অনন্য। তাঁর এ রীতির কোন সার্থক অনুসরণকারীর সন্ধানও আমরা পাইনি।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসংশয়ে প্রজ্ঞা ও মনীষার ধারক। কবিতা

রচনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রেরণার চেয়ে বেশী নির্ভর করতেন তাঁর সহজাত প্রজ্ঞা ও মনস্বিতার উপর। একটি কবিতাকে তিনি মেজে ঘসে যে পর্যন্ত নিজের মনোমত নিটোল করে তুলতে না পারতেন সে পর্যন্ত তা তিনি প্রকাশ করতেন না। এত বিবেকবান শিল্পী তিনি ছিলেন বলেই তাঁর সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সাহিত্যসাধনার ফল মাত্র খান ছয়েক চটি কবিতার বই ও দুইখানি ক্ষুদ্রকার প্রবন্ধ পুস্তকে সীমায়িত। তাঁর কবিতার নিটোল গঠন বিশ্লেষণ করলেই তাঁর কবিকর্মের নিষ্ঠা সহজে ধরা পড়ে। নতুন নতুন শব্দায়নে যে কুণ্ঠিত তিনি দেখিয়েছেন তা বোধ হয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। সুধীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার বিকাশে যেসব প্রভাব কার্যকর হয়েছিল তার মধ্যে কবিগুরুর সাহচর্য ছিল অন্যতম। জীবনের গঠনমূলক একটা পর্যায়ে কবিগুরুর দুর্লভ সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনার যে অপূর্ব সমন্বয় আমরা দেখতে পাই ভিন্নরূপে হলেও তার সুনিশ্চিত প্রক্ষেপণ আমরা দেখি সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে। একাধিক পাশ্চাত্য ভাষায় সুপণ্ডিত সুধীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্যে পারঙ্গম ছিলেন—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন, তাঁদের কাছে তাঁর পাশ্চাত্য জীবনধারার স্বরূপও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এই নয়। আহারে বিহারে আচারে আচরণে যে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্যধর্মী, তিনিই আবার মানসিক ভাব প্রকরণের দিক থেকে ছিলেন পুরোপুরি ভারতীয়। তাঁর কবিতাবলীতে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি থেকে নেয়া অনেক উপমা, উৎপ্রেক্ষা এই সত্যেরই পরিচয় বহন করে। এক্ষেত্রে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর কবি মাইকেলের সমগোত্রীয় অবশ্য এঁদের দুজনের কবিসত্তায় এর বাইরে আর কোন সাদৃশ্য নেই।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর কবি। এ শতাব্দীর যা কিছু বেদনা, নৈরাশ্য ও বিক্ষোভ তার সব কিছুতে তাঁর কবি-শরীর নানাভাবে বিদ্ধ। এই যন্ত্রণা, নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধকে তিনি বিস্ময়কর নিপুণতার সঙ্গে ধরে রেখেছেন তাঁর কবিতারাজিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নেমে এসেছিল যে বিক্ষোভ ও নৈরাশ্যের অন্ধকার অন্যান্য বহু স্রষ্টার মত সুধীন্দ্রনাথও অংশভাক হয়েছিলেন। জীবনের যা কিছু পুরাতন মূল্যবোধ তা ভেঙ্গে পড়েছিল অথচ নতুন কোন মূল্যবোধও সৃষ্টি হয় নি। এই অবস্থার মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের কবি জীবনের আরম্ভ। জীবনের এই শূন্যতাবোধ বুদ্ধিবাদী সুধীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং তাঁর কবিতায় এই শূন্যতাবোধকেই তিনি মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা সোভিয়েট রাশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা। আমাদের কবিকুলের মধ্যে অনেকে কম্যুনিজমের মধ্যে জীবনের নতুন মূল্যবোধ খুঁজে পেতে চেয়েছেন এবং সেই পথে এগিয়ে গিয়ে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু কোনদিন স্বমতচ্যুত হন নি। বেদনায় বিক্ষত চিত্ত নিয়ে তিনি পরপারে চলে গেছেন—যে মতবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, তাঁর কৃত্রিম ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তিনি জীবনের যন্ত্রনার লাঘব করতে চান নি। বোধ হয় প্রত্যেক সংকবি ও শিল্পীর ধর্মই এই।

সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের আর একটি বড় দিক হল 'পরিচয়' সম্পাদক রূপে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'পরিচয়' আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে যে আলোড়ন এনেছিল সে কথা সহজে ভোলার নয়। সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে যে পরিচ্ছন্ন মন ও রুচির অধিকারী ছিলেন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ত্রৈমাসিক 'পরিচয়ে'। 'পরিচয়ের' অনুসরণে তার পরে বহু ত্রৈমাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছে বাংলা দেশে। কিন্তু তার কোনটিই সুধীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্ট্যান্ডার্ডে উঠতে পারেনি। 'পরিচয়' মূলত সাহিত্য পত্রিকা হলেও দেশের ও বিদেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম দর্শন চর্চা ছিল তার বিঘোষিত আদর্শাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সুধীন্দ্রনাথের প্রয়াসে যে বিদগ্ধ লেখকগোষ্ঠী 'পরিচয়ের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা নানাভাবে বাংলার

সাহিত্যসীমাকে করেছিলেন প্রসারিত। নতুন মনন ও চিন্তাশীলতার মুখপত্র হিসাবে 'পরিচয়' শুধু সাময়িক পত্রিকা ছিল না, ছিল একটা জীবন্ত সাহিত্যিক আন্দোলন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্র পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনার স্থান দখল করেছিল একটা উপভোগ্য জিনিস। তারপর গ্রন্থ সমালোচনার স্থান দখল করেছিল খবরের কাগজে গ্রন্থ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সাহিত্য সাময়িকগুলিতেও গ্রন্থ সমালোচনার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল গৌণ। 'পরিচয়' গ্রন্থ সমালোচনাকে পুনরায় তার যথাযোগ্য আসন দিয়েছিল। 'পরিচয়ের' গ্রন্থ সমালোচনা সাহিত্যের মতই উপভোগ্য জিনিস ছিল। 'পরিচয়' সুধীন্দ্রনাথের হস্তচ্যুত হবার পর গ্রন্থ সমালোচনায় সে ধারাও লুপ্ত হতে চলেছে। সমালোচনার স্থান দখল করেছে খবরের কাগজে গ্রন্থ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি। সাহিত্যপত্র-পত্রিকাগুলিও এই দোষে দুষ্ট।

সুধীন্দ্রনাথের চারিত্রিক আভিজাত্য যেমন ছিল শিখরস্পর্শী তেমনই সহজ ছিল তাঁর চরিত্রের বনেদী অমায়িকতা। পাণ্ডিত্যের অহমিকা তাঁর চরিত্রে ছিল না বললেই হয়। অগাধ বিদ্যাবত্তা ছিল বলেই হয়তো তিনি ছিলেন লাজুক প্রকৃতির। সভাসমিতিকে তিনি এড়িয়ে চলতেন সযত্নে। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তিনি যখন ত্রৈমাসিক 'পরিচয়কে মাসিকে রূপান্তরিত করেন তখন। আমার তখন ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায়। সুধীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন হাজরা রোডে। এই সময় মাসিক পরিচয়ে আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম হাজরা রোডের বাড়িতে। বলা বাহুল্য পরিচয় দেওয়া মাত্র তিনি হাসামধুর মুখে নমস্কার জানিয়ে বসতে বললেন—এগিয়ে দিলেন তাঁর আতিথ্যের নিদর্শন সুপরিচিত সিগারেটের কৌটাটি। সেদিন তাঁর সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছিল আজ তা আর স্পষ্ট মনে নেই। তবে সেদিন সুধীন্দ্রনাথের নিরহঙ্কার অভিজাত ব্যক্তিত্বের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরেছিলাম পরবর্তী কালে সেই শ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমে নি। অনেক ক্ষেত্রে দেখি দূর থেকে যাঁদের সম্বন্ধে মনে শ্রদ্ধা জাগে কাছে গেলে সে শ্রদ্ধা ক্রমে কমে যায়। সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন এর তীব্র ব্যতিক্রম। তাঁর মত বন্ধুবৎসল উদারহৃদয় মানুষ খুবই কম দেখা যায়। অমিত বিত্তের সঙ্গে সঙ্গে সমপরিধির চিত্তের অধিকারীও তিনি ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের পরে নানাভাবে নানা পরিবেশে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি যখন দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনরে চীফ ইনফরমেশান অফিসার ছিলেন তখন কর্মসূত্রে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁর সেই সহজাত অমায়িকতার ব্যতিক্রম দেখি নি কোনদিন। সর্বশেষ তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম গত ১লা বৈশাখ কবি বুদ্ধদেব বসুর গৃহে এক ঘরোয়া আমন্ত্রণে। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁর মধুর সাহচর্যে কেটে ছিল। তিনি এবং বুদ্ধদেব বাবু আলোচনা করছিলেন বিশ্বসাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আর আমি বিমুগ্ধ চিত্তে সেই বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা শুনছিলাম।

বাংলা কবিতা ও গদ্যে যে দার্ঢ্য ও ঋজুতা সুধীন্দ্রনাথ এনেছিলেন তার গুরুত্ব কতখানি সে বিচার করবে ভাবীকাল। তাঁর মৃত্যুতে আমরা যা হারালাম তা সহজে পূরণ হবে না। যখন ভাবি তাঁর সদাহাস্যময় মধুর ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ আর পাবো না, শুনতে পাবো না তাঁর কণ্ঠের অপূর্ব আবৃত্তি তখন বিষণ্ণতায় মন ভরে ওঠে। তাঁর সাহিত্যরীতির ধারাকে সার্থক সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাঁর এমন কোন উত্তরসূরীর সন্ধান আজও মেলে নি। তাই মনে হয় বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ জীবনে মরণে অনন্যই রয়ে গেলেন।

গোপাল ভৌমিক

আ লো চ না

সুধীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা

আধুনিক বাংলাকাব্যের আলোচনা প্রসংগে একদা জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছিলেন "সবচেয়ে নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা।" এক কথায় সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ ও কবিস্বরূপের এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে সক্ষম, এর চেয়ে যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয় বোধ হয়। জীবনানন্দ দাশের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে, আমার ধারনা, সুধীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিসত্তা স্ব-রূপে বিধৃত।

না,—সুধীন্দ্রনাথ আশার গান গেয়ে শোনান নি। কোন স্বর্ণোজ্জ্বল কল্পলোকের সন্ধান তিনি দিয়ে যাননি। অতীতের কোন ধূসর মায়ালোক সৃজন করে ডাকেননি তার অধিবাসী হতে। তিনি ভোলাতে চাননি, কারণ, তিনি নিজে ভোলেননি। এক সংক্ষুব্ধ, মেঘভারানত, অন্ধকারে আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালেন। আমাদেরও ডাকলেন, অবহিত করে দিতে চাইলেন। তাঁর একটা কবিতার বইয়ের নাম 'সংবর্ত'। এই নামকরণ তাৎপর্যহীন নয়।

প্রত্যেক সৎকবিকেই জীবন-যন্ত্রণাকে, যুগযন্ত্রণাকে জানতে হয় মর্মে মর্মে। বিশেষ করে যে কবি এই শতাব্দিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, বর্দ্ধিত হয়েছেন; জীবন ও যন্ত্রণা তার কাছে সমার্থক বলে প্রতিপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তিরিশের যুগের কবিদের সকলেই কম বেশী এই যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রণাই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যন্ত্রণাহীন অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। এবং বিস্ময়ের বিষয়, তাঁর সমকালীন কবিদের প্রায় সকলেই যখন এই যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ব্যাকুল; সুধীন্দ্রনাথ—একমাত্র সুধীন্দ্রনাথই এই দুঃসহ যন্ত্রণাকে গ্রহণ করলেন সম্ভ্রান্ত সাহসে। লুপ্ত রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের জন্য নিষ্ফল অশ্রুপাত করলেন না, জীবনের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকারের আশ্রয় খুঁজলেন না, আত্মপ্রবঞ্চনা করলেন না অলীক ভবিষ্যস্বর্গের ধ্যানে মগ্ন হয়ে। যন্ত্রণাকেই তিনি বরণ করলেন যন্ত্রণাই সত্য জেনে।

এ কবিকে ভালো লাগার কথা নয়। এ কবিকে ভালোবাসা কঠিন। তাঁর কাব্য আমাদের প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি যে কবি হিসেবে তিনি একেবারেই পৃথক অনন্য স্ব—তন্ত্র, "গড্ডলিকার সহবাসে উত্যক্ত" মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছাসে অভ্যস্ত বাংলা কবিতার পাঠক আমরা হোঁচট খেলাম তাঁর কবিতার সংহত, নিরুচ্ছাস, স্ফটিক কঠিন, স্ফটিকস্বচ্ছপংক্তিতে। মননরিক্ত আবেগের যথেচ্ছ উদগারে মুগ্ধ আমরা অস্বস্তি বোধ করলাম তাঁর মননশীলতায় গম্ভীর,জ্ঞানঋদ্ধ, আবেগ সংহত ও সমুন্নত কাব্যের সংস্পর্শে এসে। না,— আমাদের ভালো লাগলো না তাঁর কবিতা। তাঁর মানবতার সংগে একাত্ম হতে পারলাম না। এমনকি, তিনি কবি কিনা আদৌ, এই সন্দেহও পোষণ করতে আরম্ভ করলাম কেউ কেউ। সেই সন্দেহ আজো কি ঘুচেছে? হয়তো ঘুচেছে, হয়তো না। এর মীমাংসার ভার রইলো ভবিষ্যতের হাতে। এখন নয় ঃ অন্যকোন সময়ে, আরো স্থিত, আরো নিরুপদ্রব নির্বিঘ্ন অন্যকোন সময়ে তাঁর কাব্যের যথার্থ মূল্যায়ন হবে আশা করা যায়

একটা কথা সুধীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন—কথাটা "আমি এই শতাব্দির সমবয়সী"

শতাব্দির সমবয়সী—এবং সহধর্মী। প্রতিভূও বটে। এই বিক্ষুব্ধ শতাব্দির সব সংশয়, সব যন্ত্রনা, সব অবিশ্বাস, এই সবের ফলশ্রুতিস্বরূপ অনিবার্য নৈরাশ্য বোধ, এই সব মিলিয়েই এই সব নিয়েই সুধীন্দ্রনাথ। এইসব কিছুর বাঙ্ময় উচ্চারণ তাঁর কবিতা। এবং আমি নৈরাশ্যপীড়িত, বিশ্বাসে অক্ষম, যৌবনে জরাক্লিষ্ট আমি-আমারই ছায়া প্রতিবিম্বিত দেখলাম সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে। সুধীন্দ্রনাথ যখন

"ফাটা ডিমে আর তা' দিয়ে কি ফল পাবে
মনস্তাপে ও লাগবেনা ওতে জোড়া"

এই নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ব্যঙ্গোক্তি উচ্চারণ করলেন; কিংবা—

"সহসা হেমন্ত সন্ধ্যা রূপজীবি জরতির মতো
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে..."

এই একটিমাত্র আশ্চর্য চিত্রকল্পে শতাব্দির, সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য, ক্ষয়ক্লিস্ট, করুণ রূপটি ফুটিয়ে তুললেন; অথবা

পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি?
জানি কোনদিন ফিরবেনা ফাল্গুনী,
তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে?"

এই কাতর, বিমূঢ় প্রশ্নে ব্যাকুল হলেন; তখনই আমার অন্তর বলে উঠলো—এই সেই কবি যাকে আমার কথা বলার দায়িত্ব দিয়ে আমি স্বস্তি পেতে পারি। সে দায়িত্ব—এই শতাব্দির যন্ত্রনাকে, জীবনের অপরিহার্য, প্রায় মৌলিক যন্ত্রনাকে প্রজ্ঞায় মননে, আবেগে উপলব্ধি করা; করে তাকে সামগ্রীক একটা বোধে সংহত করা। সে দায়িত্ব তিনি আমৃত্যু অটল নিষ্ঠায় পালন করে গিয়েছেন।

এ এক আশ্চর্য চেতনা যার মুকুরে আমাদের এই ক্ষয়িষ্ণু, ক্লিষ্ট শতাব্দি তার দেহমন নিয়ে প্রতিবিম্বিত। মননশীলতায় উজ্বল, বোধে প্রগাঢ় এই চেতনার সম্মুখে জীবন তার অনেক গুপ্ত গলিঘুঁজি, অনেক রহস্যময় অন্ধকার প্রকোষ্ঠ উদ্বার করে দিয়েছে। বাংলা কাব্যে এই প্রথম দেখা গেল একজন কবি নিঃশংক, নির্ভীক চিত্তে জীবনের অনবগুণ্ঠিত, ভয়াল রূপের সম্মুখে দন্ডায়মাণ। শতাব্দিবাহিত সভ্যতা, কালপ্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ, ঐতিহ্যলালিত বিশ্বাস, এই সব কিছু সম্পর্কে জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা, প্রগাঢ় সংশয় বাংলা কাব্যে এমন প্রবল, এমন নির্মোহ, নিরাবেগ সুরে উচ্চারিত হতে শুনলাম এই প্রথম। জিজ্ঞাসার সদুত্তর বোধ হয় তিনি পাননি। সংশয়ের নিরসন হয়নি।

অনুমানে সুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে;"

এই বিষাদক্লিষ্ট, নৈরাশ্যজনক উপলব্ধিই বোধ হয় তাঁর চূড়ান্ত উপলব্ধি। এই পীড়াবোধ, সংশয়, নিরন্তর অন্বেষণ—যা নাকি সৎকবির লক্ষণ—সুধীন্দ্রনাথই প্রথম উল্লেখ্যরূপে বাংলা কবিতার আত্মায় সংক্রামিত করে দিলেন। ইউরোপীয় মানসতা বলতে আমরা যা বুঝি, সুধীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় তার সংগে আমাদের পরিচয় হলো। এই পরিচয় অনিবার্য ছিলো। এই পরিচয়ের ফসল আমরা অনেকদিন অবহেলা করেছি। যখন তার মূল্য বুঝতে শিখেছি কেবল, তাকে ঘরে তুলবার আয়োজন করছি, তখনই সুধীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হলেন। লোকান্তরে সকলকেই যেতে হয়। এই জাগতিক নিয়ম আমাদের শোক আমাদের ক্ষতিকে গ্রাহ্য করে না। তবু এই কথা ভেবে কিছুতেই সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে না যে, পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে একমাত্র উজ্বল যে নক্ষত্রটি জ্বলছিল, সে ও নিভে গেল। নিভে গেল,—আর,

"তারপরে
অন্তরে বাহিরে অন্ধকার বিস্তারিল শব-প্রাবরণী।"

সুবিনয় ধর

স মা লো চ না

আসন্ন। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী। ১০বি কলেজ রো। কলিকাতা ৯। মূল্য চার টাকা

কবি অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান মগ্ন সাহিত্যিক বলে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে দুখানা কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন, তাছাড়া আছে উপন্যাস সমালোচনা ও গান। 'আসন্ন' অমিয়বাবুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'আসন্ন' পড়ে আনন্দ পেলাম শুধু সার্থক হয়েছে বলে নয়, তাঁর পূর্বেকার কাব্যপর্যায়কে অতিক্রম করে নতুন এবং পরিণততর প্রতিভাদীপ্তি এতে প্রকাশ পেয়েছে বলে।

'আসন্ন' একটি বিশেষ টেকনিকে লেখা কাহিনী-কবিতার গুচ্ছ। এতে কবিতা আছে সাতটি। কবিতাগুলি মূলত ছোটগল্পধর্মী। ছোটগল্পকে কবিতার ছাঁচে ফেলবার উপযোগিতা হচ্ছে সেইখানেই যে এতে কবি দৈনিক অভিজ্ঞতার সীমিত জগৎকে ছাড়িয়ে গিয়েও একটা 'চিরন্তন জীবনবাণী' সন্ধান করেছেন। সাহিত্য মাত্রই অবশ্য তাই। কিন্তু এখানে কবির বেদনা একটু বিশেষ ধরনের। সমাজজীবনের কতকগুলি আবর্তের মধ্যে থেকে একটা অনির্বচনীয় অনুভূতির তড়িৎ মনের মধ্যে চমকে উঠেছে। সেটা কোনো স্পষ্ট বস্তব্য নয় বলেই পুরোপুরি ছোটগল্পের লক্ষণ তাতে নেই। আছে কবিতার রস। ছোটগল্পকে কবিতার কাঠামোয় ফেলবার প্রয়াস অবশ্য নতুন নয়। সর্বশ্রী রবীন্দ্রনাথই তিনবার তার চরম সাফল্য দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, কথা ও কাহিনীর যুগে, পলাতকার যুগে এবং পুনশ্চের যুগে। পলাতকা এবং পুনশ্চর বাস্তবগন্ধি কবিতার সঙ্গে এর একটা অস্পষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করা যায় যদিও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিষয়বস্তুর যতখানি শুচিতা ও মার্জনা আছে, অমিয়রতনের তা নেই। সচেতনভাবেই অমিয়বাবু কবিতাতে সংস্কার বর্জন করবার চেষ্টা করেছেন। বাস্তববোধ এ যুগের সাহিত্যে আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাকে উপেক্ষা করে আর কবিতা লেখা যায় না। অমিয়বাবু বাস্তবের গদ্যগন্ধ পুরোপুরি বজায় রেখে কবিতাকে রসতীর্থের পথে চালনা করবার চেষ্টা করেছেন এবং কখনও কখনও বাস্তববোধ অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে যেমন 'প্রাগৈতিহাসিক'। ছোটগল্পের ডিটেলকে কবিতায় ধরে রেখে অমিয়বাবু একটা নতুন পরীক্ষা করেছেন। এজন্য অনভ্যস্ত রুচি বাধাগ্রস্তও হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই জাতীয় কবিতায় এই রীতি অনুসরণ করেননি এবং তাতে কবিতায় রস নিটোল হয়েছে বলেই মনে হয়। নানা বিচিত্র ভঙ্গি অমিয়বাবুর কবিতায় ভিড় করে আসে—মনস্তত্ত্ব, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আদর্শবাদ, মাধুর্য, চিন্তামন্থনতা। একই কবিতার মধ্যে এই বিচিত্র সমাবেশ ঘটলে স্বভাবতই আসে কথাসাহিত্যের ধর্ম কবিতার একমুখিনতাকে কাটিয়ে।

কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এই পদ্ধতি একটা নতুন জিনিস। কৈফিয়ৎ কবি ভূমিকাতেই দিয়েছেন : 'সমাজতন্ত্র বস্তুবাদের ফরমুলায় মোহগ্রস্ত না হলেও আধুনিক কবিরা অন্তরে বাহিরে সমাজসচেতন, বাস্তব সমাজ ও সাধারণ জীবন থেকেই কাব্যের সামগ্রী তাঁরা সংগ্রহ করছেন, পারিবারিক, সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামচেতনা থেকেও আহরণ করছেন কথাকাহিনী। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে দৈনন্দিন আটপৌরে

জীবনের সীলিত বিষয় ও বৈষয়িকতাই আধুনিক কবির প্রতিপাদ্য নয়, সাম্প্রতিক বিষয়ানুগত্যের ছলনায় চিরন্তন জীবনবাণীর সন্ধানে তাঁদের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সাধনা।' এই দূরকমের দৃষ্টিকে মেলাবার চেষ্টাতেই 'আসন্ন' কবিতার জন্ম। ভাষার দিক দিয়েও নতুনত্ব আছে। 'তালমান ও সুরসম্মত পদ্যরীতির মধ্যেও গদ্যকবিতার অবাধ গতি ও মুক্তির ধ্বনি' জাগাতে অমিয়রতন মিলহীন পংক্তিগুলি কথারীতি অবলম্বন করে লিখেছেন এবং সংলাপে পংক্তি ভেঙে সাধারণ গল্পের সংলাপের ভঙ্গিতেই বাক্যগুলি সাজিয়ে দিয়েছেন। অথচ পংক্তিতে স্পষ্ট ছন্দ আছে—গদ্যচ্ছন্দের মত তা কেবল স্পন্দিতই নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এগুলি আসলে ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। ভাষাতে তিনি কথ্যরীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন কিন্তু গদ্যচ্ছন্দের চেয়েও মাত্রাবৃত্ত যে অতিরিক্ত রকম পদ্যঘেঁষা তা অস্বীকার করবার উপায় নেই—

মা-বুড়ীতোমার। কে'দে বলেছিল। করো বাবা উদ্। ধার
তুমি বলেছিলে । দুমাস বাদেই । হবে সব জানা । জানি।

অমিয়বাবু একেই বলেছেন গদ্য ও পদ্যর মেশামেশি। তিনি এর একটা নতুন নামকরণ করেছেন কথাচ্ছন্দ। কিন্তু এই ছ' মাত্রার মিলহীন অসমপর্বাঙ্গ মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার ইতিপূর্বে আর একজন করেছিলেন—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে চরম কথাটি বলা সহজ নয়। একটা নতুন স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া গেল, বাংলা কবিতায় তা যদি এক নবীন অর্থ যোজনা করে, তবে সেটা হবে আশার কথা। বিশেষত এই কবিমনটি। নৈরাশ্যবাদ নেই, মরবিডিটি নেই, জীবনের শেষ সার্থকতা যিনি অন্তরের মধ্যে সূর্যের মতই জ্বালিয়ে রেখেছেন, তাঁর শক্তি দুর্লভ বলেই সুন্দর।

ভবতোষ দত্ত

দ্বিতীয় সন্ধি। দুর্গাদাস সরকার। এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২

দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে কবি দুর্গাদাস সরকারের দ্বিতীয় কাব্যসংকলন 'দ্বিতীয় সন্ধি' প্রকাশিত হয়েছে। দুর্গাদাস বাবু বেশ কিছুকাল ধরে কাব্যচর্চা করছেন এবং বলাবাহুল্য, বাংলার কবিতাপাঠক মাত্রই সেকথা জানেন। 'দ্বিতীয় সন্ধি'র কবি মূলত প্রেম ও নিসর্গের কবি, তিনি জীবন ও পরিবেশের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে স্বাভাবিক কারণেই সচেষ্ট।

কবির প্রথম কাব্যসংকলন 'অশোকের সময়ের গ্রাম' যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে কবি সেখানে প্রাকৃতিক রূপেধন স্নিগ্ধ পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা করেছেন সেই মনের গভীরে প্রবেশ করে নিসর্গের মর্মবাণী উদ্ধার করতে; কিন্তু দেখতে পাই সে ক্ষেত্রে প্রায়শই ব্যর্থ হয়েছেন পরিবেশের অন্যতর অস্থিরতায়, সমন্বয়ের চাবিকাঠির সন্ধান করতে কবির সেদিন কিছুটা অবহেলা প্রকাশিত হয়েছিল অবশ্যই।এবং সেই কারণেই পাঠক এতোদিন দুর্গাদাস বাবুর পরবর্তী সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় স্বাভাবিক কারণেই উদ্গ্রীব হয়েছিলেন। বর্তমান কাব্যগ্রন্থে কবি জীবনকে দেখতে চেষ্টা করেছেন নতুন চোখে, কষ্টার্জিত আলোয় নয়, স্বাভাবিক মনের স্নিগ্ধ আলোয়,—বাস্তবের জীবনমণ্ডকে এড়িয়ে না গিয়েও 'দ্বিতীয় সন্ধি'র বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে সে সুর হয়েছে বিস্তারিত,—'নিজের দহনে নিত্য এ ভাবে নিজেই দুঃখ পাবি' কবি

একথা মনকে বললেও তিনি জানেন :

লজ্জা আছে অনির্বচনীয়
যে-কথা আকুল করে —সে কথাও করেছি গোপন;
ভেবেছি: সে মনে যদি ভালোবাসে দেবে ঠিক মন।
যৌবনে জড়ানো থাক বাসনার মৌন উত্তরীয়।' (অন্তর্হিত)

কেননা, 'একদা সে সত্য ছিল, ছিল ঋণী আমারি প্রেমেই (দ্বিতীয় সন্ধি)'; কবি তাকেই ধ্যানে রূপদান করেন 'আমার চিন্তার জালে অচিন্ত্য চিত্রের ছায়াছবি। চয়ন করেছি নিত্য নিটোল নিখুঁত শব্দায়নে' (ঘরণী)।

আবার, 'আমার বিপুল বিশ্ব আমিই বিপুল বিশ্ব নিজে। যৌবন বন্যায় ব্রতী মন্দাকিনী, তুই ভোগবতী মাঝে তার' (মন্দাকিনী); এবং কবির নায়িকা প্রসঙ্গে ঃ 'তুমি যে অবর্ণনীয়। পরমরহস্য রমণীয়' (ঘরণী); কবি তাকে আবার দুদন্ড দেখেন—এবং বাইরের খেলা বারান্দায় দাঁড়ালে সূর্যও অবাক বিস্ময়ে থামায় তার গতি, 'দ্বিতীয় সন্ধি'র সে নায়িকা আশ্চর্য মধুর, যখন কাব্য বলেন: 'আমাকে দেখলে তার ভুল হয় গান। শুধু ঝরে। না-বলা কথার মধু বিন্দু বিন্দু তার কণ্ঠস্বরে' (পূর্বরাগ)।

অবশ্য বর্তমান যুগ-জীবনের যন্ত্রনাবিদ্ধ হৃদয়ের প্রকাশ যদিচ বর্তমান কাব্যে ইতস্তত: দুর্লভ নয়, তথাপি বলা যেতে পারে যে সাম্প্রতিক হৃদয়চর্চার ক্ষেত্রে সচরাচর যে যন্ত্রনা কেবল মনের দীনতা বা শুধুমাত্র হাহাকার হিসেবেই উচ্চারিত—সুখের কথা, প্রেমের আশ্চর্য স্নিগ্ধ আলোকসজ্জায় কবি মনের বিপুল বেদনা উত্তীর্ণ হতে পেরেছে প্রেমের অমৃত আনন্দ ধারায়।

কবি জানেন ঃ 'তোমারো পিপাসা ছিল সমুদ্রের চেয়েও গভীর;
গোপনে প্রতিটি অঙ্গে আঁকো তুমি অনঙ্গের নাম।
আমি যে পুরুষ, আর তুমি নারী এই পৃথিবীর,
তোমাকে রহস্যমুক্ত করে দিতে আমার সংগ্রাম।'

সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিফলনও দুর্গাদাসবাবুর মননে অনুপস্থিত নেই—এক হাতে শান্তি এবং অপরদিকে পারমানবিক জিজ্ঞাসাতেও তিনি অধীর, কিন্তু পাঠকের মনে হবে যে বর্তমান কাব্যগ্রন্থের সুরের বাঁধনে এই শ্রেণীর কাব্যিক প্রকরণ অপেক্ষাকৃত অন্যতর রসব্যঞ্জনার ধ্বনিত করে; 'ল্যাবরেটারী' 'সৃষ্টির গভীরে' নাটকীয় কবিতার রূপকের অন্তরালস্থিত আবেদন যতখানি প্রসারিত, সেই তুলনায় 'রশ্মিভূত' 'নাটকত্ব' প্রভৃতির কাব্য শরীরকে ঘিরে কেমন একটা গুমোট আবহাওয়া বা একটি চমকের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র; আমাদের মনে হয় কবি এগুলি অন্যসুরের আগামী কোনো সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করলে পারতেন। কয়েকটি চতুর্দশপদীতে আঙ্গিকের দিক থেকে নতুনত্বের প্রয়াস লক্ষ্যকরা গেল; 'সৃষ্টি সন্ধ' 'বিশ্বাসবতী' ছায়া ঘেরা রোদ্দুরে ঋতুকন্যায় প্রকাশিত চিত্রকল্পের প্রয়াস প্রশংসার্হ। কিন্তু 'বাঁশী'র করুণ আবহাওয়া, বা বিশেষ প্রয়োগের চতুরতা, ছন্দ ও রসব্যঞ্জনায় 'সমুদ্র সংবাদী' 'তিমিরান্তক' 'শিল্পী' বা স্বর্গাদপি গরীয়সী ইত্যাদি কবিতাবলীর মধ্যে যে কুশলী হাতের সাক্ষাৎ এবং যে আন্তরিক উত্তাপের স্পর্শ পাওয়া যায় তা 'দ্বিতীয় সন্ধি'কে কাব্যের আসরে নিঃসন্দেহে আধুনিক অনবদ্য আখ্যায়িত করবে।

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
S. 267-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।